পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়

ডঃ জয়ন্ত বসু, এম. এস-সি (টেক),
পি-এইচ. ডি (ম্যানচেস্টার)
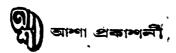
উৎসর্গ

আমার পরলোকগত পিতা
অমরেন্দ্রনাথ বসুর
উদ্দীপক স্মৃতির উদ্দেশে

পূর্বাভাষ

দুনিয়া খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের যাদুদণ্ডের স্পর্শে নতুন নতুন জগতের দ্বার খুলে যাচ্ছে এক এক ক'রে। বিজ্ঞানের 'অচলচলন' মন্ত্রবলে মানুষের কল্পলোক ক্রমেই সচল হয়ে উঠছে বাস্তবে।

পৃথিবীতে মানুষের বাস হয়ে গেল অন্তত: দশ লক্ষ বছর, কিন্তু গত দু-শ' বছরে অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী কালে বিজ্ঞানের দৌলতে যে সব আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষের করায়ত্ত হয়েছে এবং মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত যে দ্রুত হারে প্রসারিত হচ্ছে, আগেকার দিনে সে সব সম্বন্ধে কোন রকম আন্দাজ করাও সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞান যেন আলাদীনের প্রদীপের সেই বশংবদ দৈত্যটি, যাকে দিয়ে সম্ভব-অসম্ভব প্রায় সব রকম কাজই করিয়ে নেওয়া যায়। তবে ঐ প্রদীপ হল মানুষের বুদ্ধি, ওটি না থাকলে দৈত্যের আর খোঁজ পাওয়া যেত না! বিজ্ঞানের বিস্ময় বস্তুতঃ মানুষের আশ্চর্য বুদ্ধিরই বিজয়-বার্তা।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যে সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষের জ্ঞানের জগতে যুগান্তর এনেছে এবং কর্মের জগতে তাকে দিয়েছে অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকার, সেইগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটির আলোচনা এই বইয়ের উপজীব্য।

বইটিতে পরিবেশিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই কিছুটা ভিন্ন চেহারায় 'দেশ', 'বেতার জগৎ' এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল; কয়েকটি প্রচারিত হয়েছিল আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কলকাতা কেন্দ্র থেকে। পরবর্তী কালে যে সব নতুন তথ্য জানা গেছে, সেগুলির ভিত্তিতে ঐ প্রবন্ধগুলিকে পরিবর্ধিত ও

পরিমার্জিত করে এবং একটি সূত্রে গেঁথে এখানে উপস্থাপিত করা হল।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এই রচনা উপলক্ষে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতির প্রতি—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় তিনি আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে নানান সময়ে বিজ্ঞান-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় আমি উপকৃত হয়েছি।

বইটির কয়েকটি ছবি কলকাতার অ্যামেরিকান সেণ্টারের সৌজন্যে পাওয়া গেছে। সেজন্যে উক্ত সেণ্টারের কর্তৃপক্ষ আমার ধন্যবাদার্হ। এ বই লেখায় উৎসাহ দানের জন্যে শ্রীমিহির কুমার ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ যাঁর বিশেষভাবে পাওনা, তিনি আমার স্ত্রী সান্ু। এই ভদ্রমহিলা একদিকে যেমন আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি সাংসারিক দায়-দায়িত্ব অনেকখানি নিজে বহন করে আমাকে পাণ্ডুলিপি রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময় পাঠকের মনকে যদি সামান্যও অভিভূত করতে পারে, যদি পারে 'অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে' সামান্যও দীপ্ত করে তুলতে, তবে তাই হবে আমার এই বই লেখার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ইতি—

সাহা ইন্‌স্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কলিকাতা-৯ — জয়ন্ত বসু

১৪ মার্চ, ১৯৭৯

সূচীপত্র

পদার্থবিজ্ঞান পাঠে পদ এবং অর্থ—
পদার্থবিজ্ঞানের এটা নয় কোনো শর্ত।
এ বিজ্ঞান-সাগর জলে ডুব দিলে পরে
মুক্তো-মাণিক মেলে বহু থরে থরে ;
যত দেখে, তত মন বিস্ময়ে ভরে।
দাম নেই কোনো, তবু মন জানে ঠিক
এ মণি তো মণি নয়, মণিরও অধিক !

চিত্রসূচী

(আর্ট প্লেট)

১নং চিত্র—শূন্যে ভাসমান চুম্বক

একটি অতিপরিবাহী সীসার পেয়ালা থেকে বেশ কিছুটা উপরে সম্পূর্ণ সংযোগহীন অবস্থায় রয়েছে একটি দণ্ডচুম্বক। অতিপরিবাহী পদার্থের বিশেষ ধর্মের ফলেই এই ঘটনা সম্ভব হয়েছে। (বিশদ বিবরণের জন্যে ১৫নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২নং চিত্র—গবেষণাগারে কৃত্রিম নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি

কয়েকটি প্লাসমৃয়েডের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে দু'রকম আকৃতির কৃত্রিম নক্ষত্রজগৎ উৎপন্ন হয়েছে। (২৯ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উপরে : কুণ্ডলিত নক্ষত্রজগৎ

নিচে : দণ্ডযুক্ত কুণ্ডলিত নক্ষত্রজগৎ

৩নং চিত্র—আলোর ছুরি

চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রটির নমনীয় বাহুর মধ্য দিয়ে লেসারের যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ আলোক-ধারা বেরিয়ে আসে, শল্য-চিকিৎসকরা তাকে ছুরি হিসেবে ব্যবহার করেন। (১০৪ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৪নং চিত্র—লেসার রশ্মি দিয়ে জোড়া দেওয়া অক্ষিপট

মানুষের চোখের ভিতরের যে অক্ষিপট দেখানো হয়েছে, সেটি কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় লেসারের শক্তিশালী রশ্মি দিয়ে তা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জোড়া দেওয়া অংশগুলি ছবিতে সাদাটে দেখাচ্ছে।
(১০৪ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৫নং চিত্র—লেসার পেন্সিল

একটি নমনীয় আলোকবাহী নলের মধ্য দিয়ে লেসারের আলো

পাঠিয়ে এবং নলটির অগ্রভাগ থেকে সূক্ষ্ম আলোক-ধারা নির্গত হবার ব্যবস্থা করে যে লেসার পেন্সিল তৈরি করা হয়েছে, সেটিকে ব্যবহার করে আলোক-সংবেদী ফলকে লেখা হচ্ছে। (১০৫ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৬নং চিত্র—জাল স্বাক্ষর ধরে ফেলা

কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক কলম দিয়ে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে, যাতে এই কলম ব্যবহার করে কেউ জাল স্বাক্ষর করলে যন্ত্রের পর্দায় সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে একটি শব্দ : FORGERY অর্থাৎ জালিয়াতি। (১২৫ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৭নং চিত্র—ইলেকট্রনিক্স জগতের লিলিপুটিয়ান দিয়ে তৈরী একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র

ছবিতে টেবিলের উপর যে বড় পরিবর্ধক যন্ত্রটি রয়েছে, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট নামক লিলিপুটিয়ান দিয়ে তৈরী তার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বিজ্ঞানী হাতে ধরে রেখেছেন। যন্ত্রটিতে ব্যবহৃত একটি অতিক্ষুদ্র সক্রিয় উপাদান ছবিটির ভিতরের অংশে দেখা যাচ্ছে। (১৩৮ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৮নং চিত্র—ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তোলা ভাইরাসের ছবি

উপরে : ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (পরিবর্ধনের মাত্রা = ৪০,০০০)। এদের অধিকাংশই গোলাকৃতি।

নিচে : কোলাই-ভাইরাস (পরিবর্ধনের মাত্রা = ৭০,০০০)। এদের দেহ গোলাকার, তবে প্রায় প্রত্যেকেরই একটি লম্বা লেজ থাকে। (১৬৬নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১নং চিত্র

২নং চিত্র

৩নং চিত্র
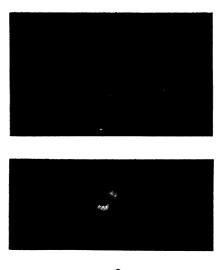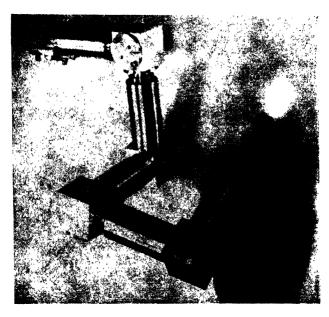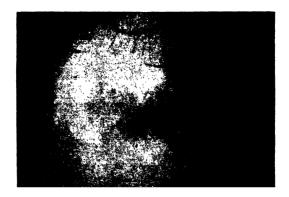
৫নং চিত্র

৭নং চিত্র
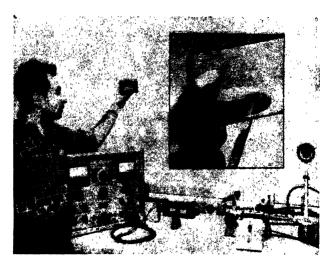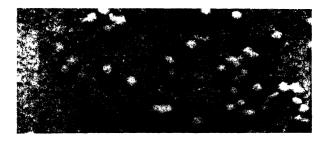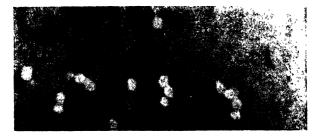
পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ

আমাদের পুরাণের একটা মজার গল্প আপনাদের বলি। এক সময় এক অসুর বহু দিন মহাদেবের কঠিন তপস্যা করলে মহাদেব খুশি হয়ে তাকে বর দিতে আসেন। অসুর বললে, আমাকে এমন বর দিন যাতে আমি আমার হাত দিয়ে যা স্পর্শ করবো, তাই যেন তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যায়। মহাদেব সাদাসিধে দেবতা, ভক্ত বর চেয়েছে, বললেন, তথাস্তু। আর বলেই প্রায় চমকে উঠলেন। কারণ তাঁর বর ঠিক ফলে কি না, তাঁকে স্পর্শ করে তাই পরীক্ষা করবার জন্যে সেই ভক্ত ভস্মাসুর ততক্ষণে তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। যঃ পলায়তে, সঃ জীবতি—মহাদেব আর কি করেন, দৌড়তে লাগলেন। ভক্তও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও তাড়া করেছে। মহাদেব পালাতে পালাতে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ব্রহ্মা সাহায্য করবেন কি, নিজেই পালাতে পারলে বাঁচেন! তখন মহাদেব বিষ্ণুর কাছে গেলেন। এখন, বিষ্ণু হচ্ছেন পালনকর্তা, তাবৎ বিশ্বের যত ধুরন্ধরকে তাঁকে আয়ত্তে রাখতে হয়, তাঁর মাথায় নানারকম বুদ্ধি খেলে। তিনি মহাদেবকে গা ঢাকা দিতে বলে নিজে এক বুড়ী সেজে রইলেন। ভস্মাসুর এসে যখন বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলো, মহাদেব কোন্ দিকে গেছে, তখন বুড়ী জানতে চাইলো, মহাদেবকে তার কি দরকার। ভস্মাসুর বললো, মহাদেবকে স্পর্শ করে তাঁর বর ফলে কি না, তাই সে পরীক্ষা করতে চায়। সেই শুনে বুড়ী বললো, তা বাপু, তোমার নিজের মাথাতেই হাত দিয়ে দেখ না! ঝোঁকে পড়ে অসুর যেই মাথায় হাত দিয়েছে, অমনি সে নিজেই ভস্ম হয়ে গেল।

আচ্ছা, এই ধরনের গল্প কি সত্য হতে পারে? পারে যদি ধরে

নেওয়া যায়, ভস্মাসুরের হাত বিপরীত পদার্থ (Anti-matter) দিয়ে গঠিত হয়ে গেছলো। কারণ সাধারণ পদার্থের সঙ্গে বিপরীত পদার্থের যোগাযোগ হলে উভয়েই ভস্মীভূত হয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায়, তার বদলে পাওয়া যায় খানিকটা শক্তি। এই আশ্চর্য বিপরীত পদার্থ যে কি, তা বুঝতে হলে প্রথমে সাধারণ পদার্থের অন্তর্রহস্য কিছুটা জানা দরকার। আমরা জানি যে, বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে পদার্থ গঠিত। এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, দশ কোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে মাত্র এক ইঞ্চির মত। আবার ঐ ক্ষুদ্র পরমাণুর গঠন কেমন? তার গঠন হল অনেকটা সৌরজগতের মত। সৌরজগতের মাঝখানে যেমন সূর্য আছে এবং গ্রহাদি তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে, পরমাণুর মধ্যে তেমন রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস আর তার চারপাশে ঘুরছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনের চেয়ে ওজনে অনেক ভারী, তবে আকারে সে তুলনায় বিশেষ পার্থক্য নেই। পরমাণুর ভিতরের বেশির ভাগটাই শূন্য; মধ্যের নিউক্লিয়াসটি পরমাণুর তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, সমগ্র পরমাণুটি যদি একটি সাগরের সমান হয়, নিউক্লিয়াস তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি জাহাজ মাত্র। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবার দু'ধরনের মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের নাম হল প্রোটন ও নিউট্রন।

এই যে তিন রকমের মৌলিক কণা—নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন, এদের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি বিভিন্ন। ব্যাপারটা একটু খুলে বলছি। কোন পদার্থ বিদ্যুৎসম্পন্ন হলে সেই বিদ্যুৎ দু'ধরনের হতে পারে—ধনাত্মক (পজিটিভ) বা ঋণাত্মক (নেগেটিভ)। প্রোটন হচ্ছে ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন, ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন; আর নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎই নেই অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, নিউট্রন বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী পি. এ. এম. ডিরাক ইলেকট্রন সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হন যে, যখন ইলেকট্রন রয়েছে তখন বিপরীত ইলেকট্রন বলেও একটি কণা অবশ্য আছে। এই কণার ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান, কিন্তু এর বৈদ্যুতিক প্রকৃতি ইলেকট্রনের বিপরীত। ইলেকট্রন যেখানে ঋণাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন, এই কণা সেখানে ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন। ধনাত্মক বা পজিটিভ বিদ্যুৎ আছে বলে এর নাম দেওয়া হল পজিট্রন। চার বছর পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সি. ডি. অ্যাণ্ডারসন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজির গবেষণাগারে পজিট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এই পজিট্রন আমাদের জগতে ক্ষণস্থায়ী, কারণ এখানে বহু ইলেকট্রন থাকায় কোন পজিট্রন সৃষ্টি হওয়ার সামান্য সময়ের মধ্যেই তা কোন না কোন ইলেকট্রনের সংস্পর্শে আসে এবং তখন কণা ও বিপরীত কণার মিলনে উভয়েই ভস্মীভূত হয়ে একেবারে বিলীন হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ায় পদার্থ সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এটাও বলে রাখি যে, যথোপযুক্ত শক্তির রূপান্তরে আবার ইলেকট্রন ও পজিট্রন জোড়ের উৎপত্তিও সম্ভব অর্থাৎ কেবলমাত্র শক্তি থেকেই একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন একসঙ্গে তৈরি হতে পারে। পদার্থ যে শক্তিতে বা শক্তি যে পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে, তা মহামতি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে আগেই জানতে পারা গেছলো।

ইলেকট্রনের মত প্রোটনেরও কি কোন বিপরীত কণা আছে? ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ই. সেগ্রে এবং ও. চেম্বারলেন নামে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক বিভাট্রন নামে বিশেষ শক্তিশালী যন্ত্র ব্যবহার করে বিপরীত প্রোটন (Anti-proton) উৎপাদন করতে সমর্থ হন। অতঃপর দেখা গেল যে, নিউট্রনেরও বিপরীত কণা আছে; নিউট্রন ও বিপরীত নিউট্রন একত্র হলে পরস্পরের বিলুপ্তি ঘটায়। কেবল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের নয়, মেসন, নিউট্রিনো প্রভৃতি অন্যান্য যে সব মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদেরও বিপরীত কণা রয়েছে।

কয়েক বছর আগে বিপরীত ডয়টেরন গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডয়টেরন হচ্ছে ডয়টেরিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস। ডয়টেরিয়াম হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ ঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যেখানে একটি মাত্র বৈদ্যুতিক কণা—একটি প্রোটন—আছে, ডয়টেরিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসেও সেখানে একটিই প্রোটন রয়েছে, তবে তার সঙ্গে রয়েছে একটি নিউট্রন ; সেজন্যে ডয়টেরিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভরের চেয়ে বেশি। ডয়টেরনে যেখানে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন, বিপরীত ডয়টেরনে সেখানে রয়েছে একটি বিপরীত প্রোটন ও একটি বিপরীত নিউট্রন (১নং চিত্র)।

আমাদের জগতে বিপরীত কণা সাধারণতঃ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তবে সঞ্চয় বলয় (Storage ring) নামক বিশেষ ব্যবস্থায় অনেকগুলি

১নং চিত্র
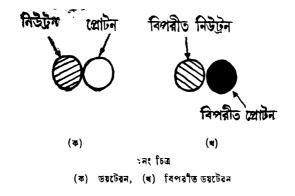
(ক) ডয়টেরন, (খ) বিপরীত ডয়টেরন

পজিট্রনকে গতিশীল অবস্থায় বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এই বলয়ের মধ্যে গতিশীল ইলেকট্রনের সঙ্গে গতিশীল পজিট্রনের সংঘর্ষের ফলে এমন সব নতুন কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের আগে কোন ধারণাই ছিল না। এই সব কণাকে বলা হয় 'সাই কণা'। সাম্প্রতিক কালে এমন সঞ্চয় বলয় তৈরি করা

গেছে, যাতে বিপরীত প্রোটনকেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখা যাচ্ছে।

যাহোক, বিপরীত ডয়টেরনের আবিষ্কার থেকে বোঝা গেল যে, প্রোটন ও নিউট্রন একত্র হয়ে যেমন নানান পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারে, বিপরীত প্রোটন ও বিপরীত নিউট্রনও একত্র হয়ে সেই রকম নানান বিপরীত পরমাণুর বিপরীত নিউক্লিয়াস গঠন করতে পারে। তাহলে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন নিয়ে যেমন পরমাণু গঠিত হয়, বিপরীত প্রোটন, বিপরীত নিউট্রন ও পজিট্রন নিয়ে তেমনি বিপরীত পরমাণু তৈরি হওয়া সম্ভব (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। আবার বহু পরমাণুর সংযোগে যেমন পদার্থের সৃষ্টি হয়, বহু বিপরীত পরমাণুর

২নং চিত্র
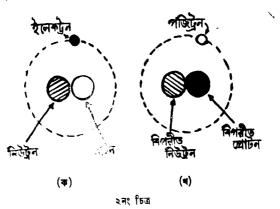
(ক) ডয়টেরিয়াম পরমাণু, (খ) বিপরীত ডয়টেরিয়াম পরমাণু

সমন্বয়ে তেমনি বিপরীত পদার্থের উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের সাধারণ পদার্থের জগতে এই বিপরীত পদার্থ অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হবে কারণ তা কোন সাধারণ পদার্থের সংযোগে এলে উভয়েই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে এই পদার্থ যদি সাধারণ পদার্থের থেকে দূরে থাকে, তাহলে সাধারণ পদার্থের মতই তা স্থায়ী হতে পারে। সুতরাং বহু বিপরীত পদার্থের সংযোগে বিপরীত জগতের সৃষ্টি হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

এই ধরনের জগতের অস্তিত্ব আছে কি না, তা জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এখানে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, দূরের কোন জগৎ থেকে যে আলো বা অন্যান্য বিকিরণ আমাদের কাছে এলে আমরা সেই জগতের সন্ধান পাই, সাধারণ ও বিপরীত জগতের ক্ষেত্রে তা মনে হয় মূলতঃ একই রকম হবে। তবে কোথাও যদি কোন বিপরীত জগৎ কোন সাধারণ জগতের সংস্পর্শে এসে থাকে, তাহলে সংস্পর্শ অনুযায়ী উভয়ের অংশবিশেষ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হতে থাকবে, সেটা লক্ষ্য করে বিপরীত জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে।

বিস্ফোরণের কথায় মনুষ্য-সৃষ্ট বিস্ফোরক বোমার কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। অ্যাটম বোমা বা পারমাণবিক বোমার কথা আমরা শুনেছি। এই অ্যাটম বোমার চেয়ে বহু গুণ শক্তিশালী হল হাইড্রোজেন বোমা। আবার পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ দিয়ে যদি মানুষ বোমা তৈরি করতে পারে, তবে সেই এক একটি বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসের ক্ষমতার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি হবে। তবে আশার কথা, এই ধরনের বোমা তৈরির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। নইলে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ অচিরেই ভস্মাসুরের মত নিজেই হয়তো নিজের সমূল বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

পদার্থের তুরীয় অবস্থা :
অতিতারল্য ও অতিপরিবাহিতা

(১)

ভাই বাতায়নদা,

শুনেছি হিমালয়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা যান তুরীয় অবস্থা লাভ করবার জন্যে। হিমালয়ের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় তাঁদের সব রিপু একেবারে গুটিসুটি মেরে যায়, মন হয়ে যায় মুক্ত, বাধাশূন্য। আমাদের অধ্যাপিকা সবিতাদি কাল ক্লাসে যা বললেন, তা থেকে বুঝলুম, খুব ঠাণ্ডায়—হিমালয়ের চেয়েও অবশ্য অনেক বেশি ঠাণ্ডায়—কোন কোন পদার্থও এক ধরনের তুরীয় অবস্থা লাভ করে। যেমন—তরলীভূত হিলিয়াম নাকি তখন কোন বাধাকেই বাধা বলে গ্রাহ্য করে না; এমন সব সরু নল ও সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বিনা বাধায় সে স্বচ্ছন্দ গতিতে গলে যায়, যেখান দিয়ে সাধারণ তরল পদার্থ একটুও গলতে পারে না। তরল হিলিয়ামের এই আশ্চর্য গুণকে বলা হয়, সবিতাদি জানালেন, Superfluidity বা অতিতারল্য। আবার খুব ঠাণ্ডায় অনেক ধাতুর ভিতরের বেশ কিছু ইলেকট্রন একেবারে বাধাশূন্য অবস্থায় চলাফেরা করতে পারে। ইলেকট্রনগুলির সেই অবাধ গতির ফলে ঐ সব ধাতুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের কোন রকম অন্তরায় থাকে না। ধাতুগুলির বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা তখন হয়ে যায় অসীম। এই বিশেষ গুণটির নাম, সবিতাদি জানালেন, Superconductivity বা অতিপরিবাহিতা।

অতিতারল্য ও অতিপরিবাহিতা সম্বন্ধে আরো কিছু জানবার জন্যে আমাদের খুব কৌতূহল হল। কিন্তু সবিতাদির পিছনে সিলেবাসের

তাড়া আছে এবং সিলেবাসে যা থাকে, তা সাদামাটা জিনিষ, এই সব 'অতি'-র সেখানে বালাই নেই। ওগুলি সম্পর্কে কঠিন কঠিন কয়েকটি বইয়ের নাম বলে দিয়ে সবিতাদি তাই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। 'অতি'-গুণগুলি সম্পর্কে জানবার আমার সাধ আছে, কিন্তু ঐ সব অতি কঠিন বই পড়ে বোঝবার সাধ্য আমার নেই। তাই যথারীতি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি, বাতায়নদা—তুমি সহজ করে শক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যদি কিছু বলো! তোমার মধ্য দিয়ে দরকার মত জ্ঞানের আলো-বাতাস পাই বলেই না তোমার এই নাম দেওয়া! ......ইতি—

বোলপুর ৮।৭।৭৮ — তোমার স্নেহের বোল্‌তা

(২)

কল্যাণীয়াসু,

......তোমার নামের মর্যাদা রেখে তুমি যখন ফের প্রশ্নের হুল ফোটাতে সুরু করেছ, তখন আমাকেও আমার নামের মর্যাদা রাখতে হবে বৈকি। তোমাদের সিলেবাসের বাইরের জগতের কিছু আলো-বাতাস আমার মধ্য দিয়ে তুমি নিশ্চয় পাবে।

একেবারে গোড়া থেকেই সুরু করা যাক। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই। হল্যাণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী হাইকে ক্যামার্লিং ওন্‌স্‌ হিলিয়াম গ্যাসকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করে অল্প উষ্ণতার বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। কারণ ঐ রূপান্তর ঘটে ৪·২ ডিগ্রী কেল্‌ভিন উষ্ণতায় অর্থাৎ চরম শূন্য উষ্ণতা থেকে মাত্র ৪·২ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস উপরে। জানো বোধহয়, যে উষ্ণতায় জল জমে বরফ হয়, তা থেকে ২৭৩·১ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস নিচে ঐ চরম শূন্য উষ্ণতা—ওর থেকে নিচে আর কোন উষ্ণতা সম্ভব নয়। চরম শূন্যের কাছাকাছি পদার্থের সেই তুরীয় অবস্থা দেখতে

পাওয়া গেল, যার কথা তোমার চিঠিতে তুমি বলেছ। প্রথম যে লক্ষণ আবিষ্কৃত হল, তা হচ্ছে অতিপরিবাহিতা—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ওন্স্ নিজেই এটি আবিষ্কার করেন। পারদ নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন যে, পারদের উষ্ণতা কমাতে থাকলে ৪.২ ডিগ্রী কেল্‌ভিনের কাছে পারদের বৈদ্যুতিক রোধ বা বিদ্যুৎপ্রবাহে বাধার পরিমাণ হঠাৎ খুব কমে গিয়ে একেবারে শূন্য হয়ে যায়, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, পারদের পরিবাহিতা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়ে একেবারে অসীম হয়ে যায়। পদার্থে যে অবস্থায় সীমার মধ্যে অসীমের এই প্রকাশ ঘটে, ওন্স্ তার নামকরণ করলেন—অতিপরিবাহী অবস্থা। পদার্থের এই অবস্থা আবিষ্কারের জন্যে ওন্স্ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তুমি বোধ করি জানো যে, কোন উৎস থেকে ধাতুখণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে সেই উৎসকে সরিয়ে নিলে বিদ্যুৎপ্রবাহ সামান্য সময়ের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। অতিপরিবাহী পদার্থের রোধ শূন্য হওয়ায় ঘটনা যে সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়, ওন্স্ তা খুব ভাল ভাবে দেখিয়েছিলেন। সীসার তারের একটি বলয়কে তরল হিলিয়ামের মধ্যে ডুবিয়ে ওন্স্ ব্যাটারীর সাহায্যে সেই অতিপরিবাহী বলয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করেন। তারপর সেই ব্যাটারী সরিয়ে নিয়ে একটি বিশেষ ফ্লাস্কে করে বলয়টিকে হল্যাণ্ড থেকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসেন এবং সেখানে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের একেবারে অবাক করে দিয়ে দেখান যে, বলয়টিতে বিদ্যুৎপ্রবাহ সম্পূর্ণ অব্যাহত রয়েছে। বহু বছর পরে ঐ রকম একটি অতিপরিবাহী সীসার বলয়ের মধ্যে একবার বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে এস. সি. কলিন্স নামে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজির একজন অধ্যাপক দেখেছেন যে, আড়াই বছর পরেও সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ অব্যাহত আছে, কোন রকম পরিবর্তন তিনি ধরতে পারেন নি।

অতিপরিবাহী পদার্থের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। কোন

চুম্বকের দুই প্রান্তের মধ্যে যে চৌম্বক বলরেখা থাকে, প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে পরীক্ষা করে তোমরা নিশ্চয় তা দেখেছ। এখন, দুই প্রান্তের মধ্যে কোন ধাতুখণ্ডকে রেখে দিলে তার মধ্য দিয়েও চৌম্বক বলরেখা বজায় থাকবে। এইবার ধাতুখণ্ডটির উষ্ণতা খুব কমিয়ে যেই সেটিকে অতিপরিবাহী করে তোলা যায়, অমনি তার ভিতরের সব বলরেখাকে সে জোর করে তার ভিতর থেকে বের করে দেয়। এইসঙ্গে যে ছবি (১নং চিত্র) পাঠাচ্ছি, তাতে দেখতে পাবে, একটি অতিপরিবাহী গোলক থেকে বহিষ্কৃত হয়ে চৌম্বক বলরেখাগুলি গোলকটির চারদিকে কেমন ভাবে বেঁকে রয়েছে। অতিপরিবাহী পদার্থের মধ্যে কোন চৌম্বক

১নং চিত্র
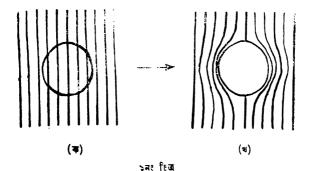
(ক)—চৌম্বক বলরেখা ও মাঝখানে একটি পরিবাহী গোলক

(খ)—গোলকটি অতিপরিবাহী হলে চৌম্বক বলরেখা তার মধ্য থেকে বহিষ্কৃত

বলরেখা থাকতে পারে না, অর্থাৎ সেটি সম্পূর্ণভাবে তিরশ্চুম্বকীয়। (যে পদার্থের মধ্যে চৌম্বক বলরেখা কমে যায়, তাকে বলে তিরশ্চুম্বকীয় (Diamagnetic) পদার্থ)। অতিপরিবাহী পদার্থের এই বিশেষ ধর্মটি মাইস্‌নার ও অখ্‌সেন্‌ফেল্ড ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে চৌম্বক বলরেখা অতিপরিবাহী পদার্থের ভিতর যৎসামান্য দূরত্ব পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। এই দূরত্বকে বলা হয় ভেদ গভীরত্ব (Penetration depth)। চরম শূন্য উষ্ণতার

কাছে সেই গভীরত্বের পরিমাণ এক সেন্টিমিটারের লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত।

যাই হোক, চৌম্বক বলরেখাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা অতি-পরিবাহী পদার্থের ভিতর ভাল ভাবে ঢোকবার চেষ্টা করতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে যদি একটি নির্দিষ্ট সীমার উপর তোলা যায়, তবে তারা জোর করে ভিতরে ঢুকে পড়ে অতিপরিবাহী পদার্থের 'অতি'-ত্ব নষ্ট করে দেয়--পদার্থটি সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। অতি-পরিবাহী পদার্থের ভিতরের বিদ্যুৎপ্রবাহকেও শুধু বাড়িয়ে একটি বিশেষ সীমার উপরে তুললে পদার্থটি যে 'অতি'-ত্ব হারিয়ে ফেলে (ওন্স্ ও এটা লক্ষ্য করেছিলেন), তার কারণ হল—বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র বড় হতে হতে তখন তার নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হল, অতিপরিবাহিতাকে ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে? এই প্রসঙ্গে সাধারণ পরিবাহী ধাতুর বিদ্যুৎরোধের ব্যাখ্যাটা আগে বলে রাখি। ধাতুর মধ্যে যে সব ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় থাকে, যে কোন নির্দিষ্ট দিকে তাদের গতিই বিদ্যুৎপ্রবাহ রূপে প্রকাশ পায়। এখন, ধাতুর কেলাসের জাফ্‌রী পাতে যে সব পরমাণু রয়েছে, সাধারণ উষ্ণতায় তারা থাকে আন্দোলিত অবস্থায়। মুক্ত ইলেকট্রনদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ইলেকট্রনদের গতিতে যে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাই বিদ্যুৎরোধ হিসাবে প্রকাশ পায়। উষ্ণতা যত কমে, পরমাণুদের চাঞ্চল্যও তত কমে আসে, ইলেকট্রনদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে, ইলেকট্রনদের গতিপথে অন্তরায় সেই সঙ্গে কমে, বিদ্যুৎরোধও ক্রমশঃ কমে যায়। সনাতনী বলবিদ্যা অনুযায়ী চরম শূন্য উষ্ণতায় পৌঁছলে পরমাণুগুলি একেবারে শান্ত হয়ে পড়বে এবং বিদ্যুৎরোধও হয়ে যাবে নগণ্য। কিন্তু উষ্ণতা শূন্যে পৌঁছানোর আগেই যে বিদ্যুৎরোধ শূন্য হয়ে গেল? এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনও জানা যায় নি, যেটুকু জানা গেছে, তাও অত্যন্ত জটিল। তবে এটা বোঝা গেছে যে, এর ব্যাখ্যা সনাতনী বলবিদ্যা থেকে হবে না, এর জন্যে দরকার কোয়াণ্টাম

বলবিদ্যার, অণু-পরমাণু জগতের কাণ্ড-কারখানা ব্যাখ্যা করতে যে বলবিদ্যার শরণাপন্ন হতে হয়।

কোয়াণ্টাম ঘটনাগুলি খুব সূক্ষ্ম। সাধারণ উষ্ণতায় পরমাণুগুলির চাঞ্চল্যের জন্যে কোয়াণ্টাম প্রকৃতি ধরা পড়ে না। কিন্তু চরম শূন্য উষ্ণতার কাছাকাছি পরমাণুগুলির চাঞ্চল্য যখন খুব কমে যায়, তখন কোন কোন ধাতুখণ্ডের সামগ্রিক কোয়াণ্টাম প্রকৃতি প্রকাশ পায়; তখন ধাতুখণ্ডটি একটি বিরাট আয়তন পরমাণুর মত, আর অতিপরিবাহী ইলেকট্রনদের অবাধ গতি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলির গতির অনুরূপ। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ফ্রিৎজ্ লণ্ডন নামে একজন বিজ্ঞানী বুঝিয়ে দিয়েছেন, অতিপরিবাহী পদার্থের ভিতর কেন চৌম্বক বলরেখা থাকতে পারে না।

যাই হোক, বিদ্যুৎরোধের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯৫০ সালে ফ্রোয়েলিখ ও বার্ডীন যে মতবাদ প্রকাশ করলেন, তাতে এ কথা বলা হল, পরমাণুদের সঙ্গে যে পরিবাহী ইলেকট্রনদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সাধারণ উষ্ণতায় বিদ্যুৎরোধের সৃষ্টি হয়, খুব কম উষ্ণতায় পরমাণুর আন্দোলনের সঙ্গে সেই সব ইলেকট্রনের গতির এমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, ঐ ঘাত-প্রতিঘাত তাদের গতিতে বাধার সৃষ্টি না করে বরং তাতে সহায়তা করে। সীসা, টিন, ট্যান্টালাম প্রভৃতি যে ধাতুগুলি সাধারণ উষ্ণতায় উৎকৃষ্ট পরিবাহক নয়, অর্থাৎ যাদের মধ্যে পরমাণু ও পরিবাহী ইলেকট্রনদের পারস্পরিক ক্রিয়া জোরালো, তারাই যে আবার অপেক্ষাকৃত সহজে, অপেক্ষাকৃত বেশি উষ্ণতাতেই অতি-পরিবাহী হয়ে যায়, তার কারণ এক্ষেত্রে ঐ পারস্পরিক ক্রিয়া ইলেকট্রনদের গতিতে বেশি সাহায্য করে। অপরপক্ষে সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি যে সব ধাতু সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পরিবাহক, তাদের অতিপরিবাহী করতে হলে আরো কম উষ্ণতার দরকার।

অতিপরিবাহিতার বিশদ ব্যাখ্যা এত জটিল যে, পদার্থের ঐ গুণ প্রায় সত্তর বছর আগে আবিষ্কৃত হলেও ওর সম্পর্কে মোটামুটি একটা

স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব খাড়া হয়েছে মাত্র একুশ বছর আগে, ১৯৫৭ সালে। তত্ত্বটির উদ্ভাবক বার্ডীন, কুপার ও শ্রীফার নামে তিনজন বিজ্ঞানী; তাঁদের নাম অনুসারে 'বি সি এস তত্ত্ব' নামে সেটি সুপরিচিত। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সোভিয়েত বিজ্ঞানী বোগোলিউবভ ও তাঁর সহকর্মীদের মতবাদও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য শুধু তত্ত্বের মুখ চেয়েই বসে নেই। অতিপরিবাহিতা সম্পর্কে তাঁরা এমন কয়েকটি পরীক্ষামূলক তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন যে, সেই তথ্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা কয়েক শ' নতুন অতিপরিবাহী পদার্থ তৈরি করে ফেলেছেন; তাঁরা এমন সব সংকর ধাতু তৈরি করেছেন, অপেক্ষাকৃত বেশি উষ্ণতাতেই যারা অতিপরিবাহী হয়ে যায়, যেমন টিন-কলোম্বিয়াম বা টিন-নায়োবিয়াম, ১৮ ডিগ্রী কেল্‌ভিনেই এদের অতি-গুণ দেখতে পাওয়া যায়। নায়োবিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও জার্মেনিয়াম দিয়ে তৈরি সংকর ধাতুর ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা ২০·৭ ডিগ্রী কেল্‌ভিন।

এই ধরনের সংকর ধাতু তৈরী করবার প্রচেষ্টার কারণ হল—অতিপরিবাহী পদার্থের যে প্রয়োগ হচ্ছে এবং আরো যে বহু প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন, বিদ্যুৎ-শক্তির কোন অপচয় না করে তাকে দূর-দূরান্তে পাঠানো), সেই সব প্রয়োগ অনেক সহজ হয়ে যায়, যদি অপেক্ষাকৃত বেশি উষ্ণতায় পদার্থের অতিপরিবাহিতা কার্যকরী হয়ে ওঠে। অবশ্য সাধারণ উষ্ণতায় অতিপরিবাহী থাকে, এমন পদার্থের সন্ধান পেলে সবচেয়ে সুবিধা। কিন্তু ধাতু বা ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে এই গুণ বোধ করি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীমহলে অনেকে আশা করেন, বিশেষ রকম জৈব অতিকায় অণু দিয়ে গঠিত পদার্থে এই গুণ হয়তো একদিন ধরা পড়বে। কেউ কেউ তো এমনও মনে করেন, বংশবৈশিষ্ট্যবাহক যে ক্ষুদ্র জীন, সেই জীনের মধ্যে অতিপরিবাহী কোন পদার্থ প্রকৃতি সৃষ্টি করে রেখেছে; সেই পদার্থের স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমে প্রকৃতি বংশবৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে।

যাহোক, বর্তমানে অতিপরিবাহী পদার্থের যে হরেক রকম ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলির বিষয় কিছু বলি। প্রথমতঃ ধরা যাক, বিদ্যুচ্চুম্বকের কথা। শক্তিশালী বিদ্যুচ্চুম্বক তৈরি করতে হলে তার তারের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠাতে হয়। সেই তারের রোধের জন্যে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎ-শক্তি তাপে পর্যবসিত হয়। ফলে বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় তো ঘটেই, তা ছাড়া বিদ্যুচ্চুম্বক যাতে না খুব গরম হয়ে ওঠে, সেজন্যে তাকে ঠাণ্ডা রাখবার বিশেষ আয়োজন করতে হয়। এখন, এই সব সমস্যা আর থাকে না, যদি অতিপরিবাহী পদার্থের তার অর্থাৎ রোধশূন্য তার দিয়ে বিদ্যুচ্চুম্বক তৈরি হয়। যেখানে প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন, সেখানে এজন্যে অতিপরিবাহী চুম্বকের প্রয়োগ হচ্ছে তবে চৌম্বক ক্ষেত্র খানিকটা শক্তিশালী হলেই তার উপস্থিতিতে সাধারণ ধাতুর অতিপরিবাহিতা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যে টিন-নায়োবিয়াম, নায়োবিয়াম-জার্কোনিয়াম, ভ্যানাডিয়াম-গ্যালিয়াম প্রভৃতি এমন সব সংকর ধাতু বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন, অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতেও যাদের অতিপরিবাহিতা বজায় থাকে। এমন অতিপরিবাহী চুম্বক এখন কিনতে পাওয়া যায়, যার চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ ৫ টেস্‌লা অর্থাৎ ৫০,০০০ গাউস। (আমরা যে সব ছোটখাটো চুম্বকের সঙ্গে পরিচিত, সেগুলির চৌম্বক ক্ষেত্র কয়েক শ' গাউস)।

অতিপরিবাহী পদার্থের এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের মূলে আছে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে বি. ডি. যোসেফসন নামে একজন ব্রিটিশ স্নাতকোত্তর ছাত্রের অবদান। যোসেফসন বলেছিলেন, কোন অতিপরিবাহী পদার্থে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকা কালে যদি তাকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয় এবং দুটি অংশের মধ্যে ফাঁক যদি যৎসামান্য হয়, তবে বিদ্যুৎপ্রবাহ সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে 'সুড়ঙ্গ' ('Tunnel') প্রক্রিয়ায় চলতে পারবে। তাঁর এই ধারণার উপর ভিত্তি করে সূক্ষ্ম মাপজোখ করবার যন্ত্রপাতি তৈরি করা গেছে। এমন যন্ত্রও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা

দিয়ে ০˙০০০০০০০০০০০০০০০০১ ভোল্টের মত সামান্য বিভব-পার্থক্যও মাপতে পারা যায়।

তারপর ধরা যাক, অতিপরিবাহী সুইচের কথা। বিদ্যুৎপ্রবাহ বা চৌম্বক ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে অতিপরিবাহী কোন উপাদানের 'অতি'-ত্ব যখন নষ্ট করে দেওয়া যায়, তখন তার বিদ্যুৎরোধের হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনার সদ্ব্যবহার করে বিদ্যুৎপ্রবাহ বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অতিপরিবাহী সুইচ তৈরি করা হচ্ছে; বিশেষতঃ ক্রায়োট্রন নামে এই ধরনের সুইচ সংখ্যাত্মক (Digital) কম্পিউটারে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কম্পিউটারের যে অংশে বিভিন্ন তথ্য সঞ্চিত থাকে, 'স্মৃতি' নামক সেই অংশেও অতিপরিবাহী পদার্থের প্রয়োগ ঘটেছে, কারণ ঐ পদার্থে বিদ্যুৎপ্রবাহ বজায় রাখা যায় এবং সেটি সহজেই স্মরণের উপাদান হিসাবে কাজ করে।

তাপশক্তির নিয়ন্ত্রণে অতিপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে। ধাতুর পরিবাহী ইলেকট্রনগুলি বাইরে থেকে তাপ নিয়ে পরমাণুগুলির সঙ্গে নিজেদের সংঘর্ষের মাধ্যমে ধাতুর মধ্য দিয়ে সেই তাপ সঞ্চালন করে দেয়। অতিপরিবাহী পদার্থে ঐ সংঘর্ষ ক্ষীণ হওয়ায় ইলেকট্রনগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক কম তাপ সঞ্চালন করতে পারে। এজন্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ধাতুর অতিপরিবাহী অবস্থা থেকে পরিবাহী অবস্থায় রূপান্তর ঘটিয়ে সহজেই তাপের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অতিপরিবাহী পদার্থের একটা চমকপ্রদ প্রয়োগের কথা বলে আমি এই চিঠি শেষ করবো, বোল্‌তা। অতিপরিবাহী পদার্থ যেহেতু চৌম্বক বলরেখাকে নিজের ভিতর থেকে বের করে দেয়, চুম্বকের উপর তার সে-জন্যে যেন একটা বিকর্ষণ-বল আছে। ঐ বলের জন্যে অতিপরিবাহী পদার্থের উপর কোন চুম্বককে বা চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে অতি-পরিবাহী কোন উপাদানকে সংযোগবিহীন অবস্থাতেই শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা যায় (আর্ট প্লেটে ১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাপারটাকে কাজে

লাগিয়ে অতিপরিবাহী জাইরোস্কোপ তৈরি করা হয়েছে। আবার এই ধর্মের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা ম্যাজিক কার্পেটের মত শূন্যে ভাসমান এমন রেলগাড়ির পরিকল্পনা করেছেন, যা মাটি থেকে বেশ কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারবে। ইতি—

কলকাতা — তোমার
১৭।৭।৭৮ — বাতায়নদা

(৩)

ভাই বাতায়নদা,

তুমি যে অতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠছো, তা তোমার চিঠি পড়ে বোঝা যায়। তুমি আরম্ভ করেছিলে অতিতারল্য ও অতিপরিবাহিতা সম্বন্ধে বলবে বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিতরল পদার্থ সম্পর্কে লিখতে তুমি ভুলে গেছ। নাকি ঐ পদার্থ এতই তরল যে, তোমার চিঠির ফাঁক দিয়ে পথে কোথাও পড়ে গেল?……ইতি—

বোলপুর — তোমার স্নেহের
২৪।৭।৭৮ — বোল্‌তা

(৪)

কল্যাণীয়াসু,

……অতিতারল্যকে আগের বার বাদ দিয়েছি, কারণ তা না হলে ডাকটিকিট অনেক বেশি লেগে যেত। আর কোন চিঠিতে টিকিট একসঙ্গে বেশি লাগালে সেটা খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কেমন জানি বেড়ে যায়।

এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমি আগের চিঠিতে বলেছি যে, ৪'২ ডিগ্রী কেল্‌ভিন উষ্ণতায় হিলিয়াম গ্যাস তরলে রূপান্তরিত হয়। এখন উষ্ণতা যদি আরো কমানো যায়, ২'২ ডিগ্রী কেল্‌ভিনে

হিলিয়ামে আর এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে। পদার্থবিদ্যার ক্লাসে তোমরা নিশ্চয় আপেক্ষিক তাপের (Specific heat) কথা পড়েছ। বিভিন্ন উষ্ণতায় তরল হিলিয়ামের আপেক্ষিক তাপের পরিমাপ করে যে ফল পাওয়া গেল, ২নং চিত্রে আমি তা দেখিয়েছি। ২'২ ডিগ্রী কেল্‌ভিনে দেখছো, আপেক্ষিক তাপের হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটছে।

২নং চিত্র
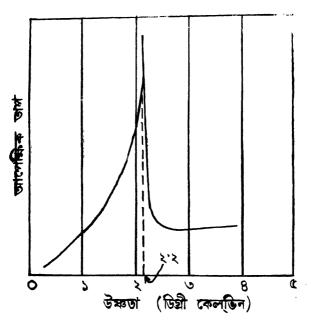
উষ্ণতার সঙ্গে তরল হিলিয়ামের আপেক্ষিক তাপের সম্পর্ক

চিত্রের রেখাটি গ্রীক অক্ষর ল্যাম্বডা-র উল্টানো চেহারার মত দেখতে বলে আপেক্ষিক তাপের হঠাৎ পরিবর্তনের উষ্ণতাকে (অর্থাৎ ২'২ ডিগ্রী কেল্‌ভিনকে) ল্যাম্বডা-বিন্দু বলা হয়। যে হিলিয়ামের উষ্ণতা ল্যাম্বডা-বিন্দুর চেয়ে বেশি, তাকে বলা হয় হিলিয়াম-I, আর যে হিলিয়ামের

উষ্ণতা ল্যাম্বডা-বিন্দুর চেয়ে কম, তাকে বলা হয় হিলিয়াম-II। হিলিয়াম-II-এর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল যে, তা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তাপ পরিবহন করতে পারে। মস্কোর বিজ্ঞানী পিটার কাপিৎজার ধারণা হল যে, ঐ তাপ পরিবহন ক্ষমতার মূলে আছে হিলিয়াম-II-এর নিজস্ব অবাধ প্রবাহ। পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, এক ইঞ্চির পঞ্চাশ হাজার ভাগের একভাগ যার ব্যাস, এমন এক সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হিলিয়াম-II অনায়াসেই প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে। জানা ছিল যে, হাইড্রোজেনের পরমাণু খুব হাল্কা বলে হাইড্রোজেন গ্যাসের সান্দ্রতা (Viscosity) বা গীতিজনিত বাধা যৎসামান্য। কাপিৎজার পরীক্ষা থেকে হিসেব করে দেখা গেল, হিলিয়াম-II-এর সান্দ্রতা হাইড্রোজেন গ্যাসের দশ হাজার ভাগের একভাগের চেয়েও কম। কাপিৎজা তখন সাহসের সঙ্গে বললেন, হিলিয়াম-II-এর সান্দ্রতা শূন্য, অর্থাৎ ঐ পদার্থ একেবারে বাধাবন্ধহীন ভাবে প্রবাহিত হতে পারে। হিলিয়াম-II-এর এই আশ্চর্য গুণের তিনি নাম দিলেন—অতিতারল্য। এটা হল ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

অতিতরল পদার্থের আর একটি অদ্ভুত ধর্মের কথা আগেই জানা ছিল। ধরা যাক, একটি ফ্লাস্কের ভিতর দুটি কক্ষে হিলিয়াম-II রাখা হল। কক্ষ দুটিতে হিলিয়ামের উচ্চতা সমান না হলে, যে কক্ষে হিলিয়ামের উচ্চতা বেশি, সেখান থেকে কিছু হিলিয়াম কোন অদৃশ্য উপায়ে অপর কক্ষে চলে যাবে, যাতে অচিরেই কক্ষ দুটিতে হিলিয়ামের উচ্চতা সমান হয়ে যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাউন্ট ও মেণ্ডেল্সন পরীক্ষা করে দেখালেন যে, কক্ষ দুটির দেয়ালে হিলিয়াম-II-এর খুব পাতলা (এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগের চেয়েও পাতলা) একটা স্তর তৈরি হয় এবং স্তরের মাধ্যমেই হিলিয়াম এক কক্ষের দেয়াল বেয়ে উঠে কক্ষান্তরে যেতে পারে (৩নং চিত্র)। সেই চলন্ত স্তরের গতি সেকেণ্ডে এক ফুটের মত হতে পারে।

অতিপরিবাহিতার মত অতিতারল্যকে ব্যাখ্যা করতে হলেও

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার শরণ নিতে হয়। সনাতনী বলবিদ্যা অনুযায়ী চরম শূন্য উষ্ণতার কাছাকাছি অণু-পরমাণুগুলি সব শান্ত হয়ে আসবে এবং যে-কোন পদার্থই কঠিন অবস্থা লাভ করবে। এখন, খুব কম উষ্ণতায়, আমরা আগেই দেখেছি, পদার্থের কোয়াণ্টাম প্রকৃতি প্রকাশ পায়। হিলিয়ামের ক্ষেত্রে হিলিয়াম তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হবার আগেই তার কোয়াণ্টাম ধর্ম প্রকট হয়ে ওঠে; ফলে সেই 'কোয়াণ্টাম তরল' হিলিয়াম-II আর সনাতনী বলবিদ্যাকে মানে না, মানে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাকে। সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর জগৎ ছেড়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাকে যেন এবার বৃহৎ জগতেও দেখতে পাওয়া গেল।

অতিতারল্যের কয়েকটি তথ্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে কোয়াণ্টাম
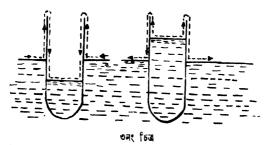
৩নং চিত্র

পাতলা স্তরের মাধ্যমে অতিতরল হিলিয়াম দেয়াল বেয়ে যাচ্ছে বাইরের কক্ষ থেকে ভিতরের কক্ষে বা ভিতরের কক্ষ থেকে বাইরের কক্ষে।

বলবিদ্যার উপর ভিত্তি করে লণ্ডন, টিসৃজা ও পরে ল্যাণ্ডাও যে তত্ত্ব রচনা করেছেন, তার মূলে আছে 'দুই তরলের মডেল'। এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিলিয়াম-II-এর দুটি উপাদান—একটি সাধারণ তরল, অপরটি অতিতরল। উষ্ণতা কমলে অতিতরলের ভাগ বেড়ে যায়, সবটাই অতিতরল হয়ে যায় চরম শূন্য উষ্ণতায়। হিলিয়াম-II যে তাপ পরিবহন করে, সে তার সাধারণ উপাদানের জন্যে; অতিতরল উপাদানটি একেবারে তাপহীন।

এই তত্ত্ব থেকে অতিতরল পদার্থের একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের কথা আন্দাজ করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'দ্বিতীয় প্রকৃতির শব্দ'। তুমি নিশ্চয় জানো যে, কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে যে শব্দ প্রবাহিত হয়, সে ঐ পদার্থের কণিকাগুলির আন্দোলনের মাধ্যমে। হিলিয়াম-II-এর সাধারণ ও অতিতরল উপাদান দুটি যখন একই সঙ্গে আন্দোলিত হয়, তখন তা হয় সাধারণ বা প্রথম প্রকৃতির শব্দ। কিন্তু একটি উপাদান যখন অন্যটির মধ্য দিয়ে আন্দোলিত হতে থাকে, তখন তা দ্বিতীয় প্রকৃতির শব্দ। এই দ্বিতীয় শব্দের অস্তিত্ব পরীক্ষা থেকেও সমর্থিত হয়েছে। অতিতরল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজে এই বিশেষ শব্দ বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে।

অতিতারল্য সম্বন্ধে আর একটা কথা, বোলতা ; তারপরেই তোমার ছুটি। যে হিলিয়ামে অতিতারল্য দেখতে পাওয়া যায়, তা হল সাধারণ হিলিয়াম—হিলিয়াম-৪, যার পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ৪টি কণা: ২ প্রোটন, ২ নিউট্রন। হিলিয়ামের কিন্তু আর একটি আইসোটোপ আছে—হিলিয়াম-৩, যার নিউক্লিয়াসে ১টি নিউট্রন কম। এই হিলিয়াম-৩ ৩·২ ডিগ্রী কেল্‌ভিন উষ্ণতায় তরলে রূপান্তরিত হলেও তার মধ্যে অতিতারল্য দেখতে পাওয়া যায় না। হিলিয়াম-৪-এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসে মৌল কণার সংখ্যা যুগ্ম হওয়ায় সেই নিউক্লিয়াস বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন মেনে চলে, আর হিলিয়াম-৩-এর ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা অযুগ্ম হওয়ায় তার নিউক্লিয়াস মেনে চলে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, যে-কোন মৌল কণার সমষ্টির মধ্যে শক্তির বণ্টন কেমন হবে, অর্থাৎ কতগুলি কণা কি পরিমাণ শক্তি বহন করবে, তা নির্দিষ্ট হয় সংখ্যায়ন দ্বারা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত ধরণের মৌলিক কণা আছে, তাদের অর্ধেক বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন মেনে চলে। এই সংখ্যায়নের প্রধান প্রবক্তা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম অনুযায়ী এদের 'বোসন' বলা হয়। বাকী অর্ধেক কণাগুলিকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী

এন্‌রিকো ফের্মির নাম অনুসারে বলা হয় 'ফের্মিয়ন' কারণ সেগুলি ফের্মি ও ডিরাকের সৃষ্ট সংখ্যায়ন মেনে চলে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে একথা বলা যায় যে, সেই তরল পদার্থেই শুধু অতিতারল্য প্রকাশ পাবে, যে পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস 'বোসন' গোষ্ঠীভুক্ত। ভাবতে ভাল লাগে, পদার্থের আশ্চর্য অতি-তারল্য ধর্মটির সঙ্গে আমাদের দেশের একজন আশ্চর্য মানুষ ও অতি-বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতি—

কলকাতা — তোমার

৭।৮।৭৮ — বাতায়নদা

প্লাজমা ঃ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। পদার্থের এই তিনটি অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের বেশির ভাগ, বলা যেতে পারে শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি, যে বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে, তাকে আমরা কঠিন, তরল বা বায়বীয় এদের কোনটিই বলতে পারি না। বরং বলা চলে, সেটা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। নাম প্লাজমা (Plasma)। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুক্‌স্‌ সর্বপ্রথম এই অবস্থাটির প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কঠিন পদার্থকে ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত করলে প্রথমে তা তরল এবং পরে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেমন বরফ থেকে জল, জল থেকে বাষ্প। কিন্তু ঐ বাষ্পেরই উষ্ণতা যদি আমরা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিই, তা পরিণত হবে প্লাজমায়।

প্লাজমা বলতে কী বুঝায় ?

এ কথা অনেকেই জানেন, পরমাণুর মোট ধনাত্মক আধান এবং ঋণাত্মক আধান পরিমাণগত ভাবে সমান হওয়ায় পরমাণু সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। উত্তাপের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে যদি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বহিষ্কৃত করা যায়, তাহলে পরমাণু-টিতে ধনাত্মক আধানের পরিমাণ ঋণাত্মক আধানের পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে। এই অবস্থায় পরমাণুটিকে ধনাত্মক আয়ন বলা হয়। ঐ রকম অনেকগুলি আয়ন ও সমান সংখ্যক বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের একত্র সমাবেশের নামই হল প্লাজমা। প্লাজমার মধ্যে নিরপেক্ষ অণু-পরমাণু থাকতে পারে, কিন্তু সব সময়ই বন্ধনমুক্ত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত

কণার সংখ্যা সমান। প্লাজমার উষ্ণতা সাধারণত ২০,০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে উঠলে তখন আর তাতে নিরপেক্ষ কণা থাকে না, সবগুলিই ভেঙ্গে গিয়ে ধনাত্মক আয়ন ও বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এই অবস্থায় প্লাজমাকে 'বিশুদ্ধ' প্লাজমা বলা যেতে পারে।

প্লাজমার মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার সংখ্যা সমান হওয়ায় প্লাজমা বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। কিন্তু কোন আহিত কণা যদি সেখান থেকে নির্গত হয়, তখন প্লাজমা বিপরীতভাবে আহিত হয়ে যায় এবং তার আকর্ষণে নির্গত কণাটি সাধারণতঃ আবার প্লাজমার মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এইভাবে পলায়নপর আহিত কণাগুলিকে একত্র ধরে রেখে প্লাজমা তার অস্তিত্ব বেশ ভাল ভাবে বজায় রাখতে পারে।

পদার্থের তৃতীয় অবস্থার সঙ্গে চতুর্থ অবস্থার অর্থাৎ গ্যাসের সঙ্গে প্লাজমার একটা বিশেষ পার্থক্য হল এই যে, গ্যাস বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে না, কিন্তু প্লাজমা পারে। এর মূলে রয়েছে প্লাজমার মধ্যে অনেকগুলি বন্ধনমুক্ত আহিত কণার উপস্থিতি। আহিত কণাই হল বিদ্যুতের বাহক। প্লাজমার মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে এই সব কণা সেই ক্ষেত্র অনুযায়ী সহজেই গতিশীল হয় এবং এদের সেই গতি বিদ্যুৎপ্রবাহ হিসাবে প্রকাশ পায়।

প্লাজমার ভিতর ইলেকট্রনের গতিবিধির ব্যাপারে কঠিন ও তরল অবস্থার মাঝামাঝি জেলির মত একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জেলির একটা অংশকে সামান্য স্থানচ্যুত করে ছেড়ে দিলে তা যেমন নিজ থেকেই স্বস্থানে ফিরে যায়, সেই রকম প্লাজমার ভিতরে কয়েকটি ইলেকট্রনকে একই দিকে সরিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে তারা আবার আগের জায়গায় ফিরে যেতে চায়। জেলির যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল, জীব-কোষের প্রোটোপ্লাজম বা প্লাজমার মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই সমান সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন ও ইলেকট্রনের একত্র

সমাবেশকে অ্যামেরিকার বিজ্ঞানী আর্ভিং ল্যাংমুয়্যার ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্লাজমা নামে অভিহিত করেন।

প্লাজমার ব্যাপক অস্তিত্ব

বস্তুতঃ প্রায় সব নক্ষত্রই প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে। আমাদের সুপরিচিত নক্ষত্র সূর্যও প্লাজমার একটি জ্বলন্ত গোলক। নক্ষত্রের অত্যধিক উষ্ণতায় অণু-পরমাণু অত্যন্ত গতিশীল হয় এবং তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে ধনাত্মক আয়ন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে ; ফলে প্লাজমার উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন উষ্ণতা ও চাপে কোন্ পদার্থে আয়ননের মাত্রা কত হয় অর্থাৎ ঐ পদার্থের অণু-পরমাণুর শতকরা কত ভাগ ভেঙ্গে গিয়ে আয়ন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে, ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি সূত্র থেকে তা সহজেই হিসাব করতে পারা যায়। ঐ সূত্রটি 'সাহার সূত্র' নামে বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত।

নক্ষত্রের ভিতরেই কেবল নয়, আন্তর্নক্ষত্র অঞ্চলেও পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীতে প্লাজমা বিরল হলেও ভূপৃষ্ঠের উপর যে প্রায় হাজার কিলোমিটার উচ্চ বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তার একটি অংশের বায়ু আয়নিত হয়ে প্লাজমা সৃষ্টি করে রেখেছে। বায়ুমণ্ডলের ঐ অংশটিকে আয়নমণ্ডল বলা হয়। দূর পাল্লার বেতার সংযোগে আয়নমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ দূর থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ ঐখানে প্রতিফলিত হয়ে তবেই গ্রাহক-যন্ত্রের কাছে পৌঁছায় (১নং চিত্র)। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যথাক্রমে অরোরা বোরিয়ালিস ও অরোরা অস্ট্রালিজ নামে যে মেরুজ্যোতি দেখা যায়, তাও এক ধরনের প্লাজমারই অভিব্যক্তি। যে ফ্লুওরেসেণ্ট ল্যাম্প বা প্রতিপ্রভ বাতির ব্যবহার এখন আমরা হামেশাই দেখে থাকি, সেই বাতি যখন জ্বলে, তখন তার ভিতরের বেশির ভাগ অংশই প্লাজমা অবস্থায় থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে এই প্লাজমার সৃষ্টি।

বিজ্ঞাপনের জন্যে বহু ক্ষেত্রে যে নিওন বাতি ব্যবহৃত হয়, তাতেও নিওন গ্যাস বৈদ্যুতিক উপায়ে প্লাজমায় পর্যবসিত হয়।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার

সংযোজন চুল্লী:—গত বিশ পঁচিশ বছর প্লাজমা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ যে অনেক বেড়ে গেছে, তার কারণ হল—প্লাজমা-মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংযোজন প্রক্রিয়ায় অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা। নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটলে

১নং চিত্র

আয়নমণ্ডলের প্লাজমায় বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন
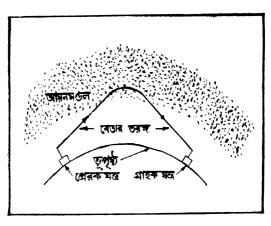
অর্থাৎ দুটি নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে একটি নতুন নিউক্লিয়াস গঠিত হলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে এতে অংশগ্রহণকারী নিউক্লিয়াসগুলির মোট ভর সামান্য কমে যায় এবং ঐ হারানো ভরই বিপুল শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সূর্য যে প্রচণ্ড শক্তির আধার, তার মূলে রয়েছে সূর্যের প্লাজমা মাধ্যমে হাইড্রোজেনের সংযোজন প্রক্রিয়া। পৃথিবীর মানুষও নিউক্লিয়াসের সংযোজনজনিত শক্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে।

সংযোজন-শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার মঙ্গলজনক ব্যবহারের জন্যে বিজ্ঞানীরা এখন বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন। এজন্যে তাঁরা যে যন্ত্রের উদ্ভাবনে উৎসুক, তাকে বলা হয় নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লী।

মনুষ্য-সভ্যতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানী এক শ' বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। জলের স্রোত, সৌরকিরণ প্রভৃতি উৎস থেকে যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, চাহিদার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট হবে না। তখন উপায় কেবল নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা সংযোজনজনিত শক্তি। ভারী নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয়, তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি পারমাণবিক বোমায়। বিভাজন চুল্লী থেকে ঐ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে পাওয়াও সম্ভব হয়েছে। যাই হোক, বিভাজনের উপযোগী জ্বালানী অনেকটা সীমিত হওয়ায় এর ব্যবহার শক্তি-সমস্যাকে এক শতাব্দী পরে মাত্র কয়েক দশক হয়তো পিছিয়ে দিতে পারবে। ভরসা কেবল নিউক্লিয়াসের সংযোজন। সংযোজনের একটি উপযোগী জ্বালানী হল হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম। সুখের বিষয়, সমুদ্রের জলে বিপুল পরিমাণ ডয়টেরিয়াম আছে। সংযোজনের জ্বালানী হিসাবে তা সভ্যতার দ্রুতবর্ধমান চাহিদাকে অনায়াসে ১০০ কোটি বছর মেটাতে পারবে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এক লিটার জলের ডয়টেরিয়াম থেকে সংযোজন প্রক্রিয়ায় যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তা ৩৫০ লিটার পেট্রোলের শক্তির সমান। আরও উল্লেখ্য যে, কয়লা থেকে শক্তি পেতে যা ব্যয় হয়, ডয়টরিয়াম থেকে শক্তি পেতে সে তুলনায় ব্যয় হবে শতকরা এক ভাগ মাত্র।

বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে যে সংযোজন চুল্লী নির্মাণের চেষ্টা করছেন, তাকে একটি ক্ষুদে সূর্য বলা যেতে পারে। সূর্যের প্লাজমা-মাধ্যমে যেমন সংযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, সেই রকম কৃত্রিম উপায়ে প্লাজমা তৈরি করে বিজ্ঞানীরা তার মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে সংযোজন ঘটাতে চাইছেন। পরবর্তী প্রবন্ধে সংযোজন চুল্লী সম্পর্কে বিশদভাবে

আলোচনা করা হবে।

এম এইচ ডি জেনারেটর :—সংযোজন চুল্লীর পরিকল্পনা এখনো সফল না হলেও তা থেকে যে শক্তি প্লাজমার তাপ রূপে পাওয়া যাবে, তাকে কী ভাবে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে, বিজ্ঞানীরা তাই নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছেন। এই যন্ত্রটিকে বলা হয় ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডাইন্যামিক জেনারেটর। ম্যাগনেটো, হাইড্রো ও ডাইন্যামিক, এই তিনটি ইংরেজী শব্দের আদ্যাক্ষরগুলি নিয়ে যন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়েছে এম এইচ ডি (MHD) জেনারেটর।

এম এইচ ডি যন্ত্রে উত্তপ্ত প্লাজমাকে জেনারেটরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে সেই প্লাজমার তাপশক্তি সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে টার্বাইন ও জেনারেটর সমন্বিত প্রচলিত ব্যবস্থার নানাবিধ উন্নতি করে তার এফিসিয়েন্সি বা কার্যকারিতা যেখানে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত করা গেছে, MHD যন্ত্রের কার্যকারিতা সেখানে বর্তমানে শতকরা ৬০ ভাগ ; অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তা ৮০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে পরবর্তী একটি প্রবন্ধে।

মহাকাশ অভিযান ও প্লাজমা

মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে মহাকাশযানকে চালিত করবার জন্যে প্লাজমা-চালিত রকেটের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রকেট কিভাবে গতিসম্পন্ন হয়, তার মূল নীতিটি আমরা প্রায় সকলেই জানি—রকেটের পিছন দিকের একটি ছিদ্র দিয়ে গ্যাস সজোরে নির্গত হতে থাকলে সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় রকেটটি সামনের দিকে চলতে থাকে। রকেটে রাসায়নিক জ্বালানী ব্যবহৃত হলে সেই জ্বালানীর দহনে যে উষ্ণতার সৃষ্টি হয়, সেই উষ্ণতার একটি উর্ধ্বসীমা থাকায় নির্গত গ্যাসের গতিবেগও একটি নির্দিষ্ট মানের বেশি হতে পারে না। রকেট চালনায়

গ্যাসের পরিবর্তে প্লাজমা ব্যবহার করার সুবিধা এই যে, বিদ্যুচ্চুম্বকীয় উপায়ে প্লাজমাকে ত্বরান্বিত করে মহাকাশযান থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি গতিসম্পন্ন অবস্থায় নির্গত করা যায়। দীর্ঘকালব্যাপী মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে বা মহাকাশ অভিযানে কক্ষপথ পরিবর্তনের পক্ষে প্লাজমা-চালিত রকেট বিশেষ উপযোগী।

মহাকাশ অভিযানে প্লাজমা অবশ্য বিপত্তিরও সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীতে ফিরে আসবার পথে কৃত্রিম উপগ্রহ যখন বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করে, তার চতুর্দিকে তখন একটি প্লাজমার উৎপত্তি হয়। উপগ্রহ থেকে ভূপৃষ্ঠে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যে যে বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তা ঐ প্লাজমাকে ভেদ করতে পারে না। ফলে উপগ্রহের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ কিছুক্ষণের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়। বেতার তরঙ্গের প্রেরক বা গ্রাহক যন্ত্রে যে অ্যাণ্টেনা থাকে, প্লাজমার মধ্যে তা নিমজ্জিত থাকলে তার বিদ্যুচ্চৌম্বক ধর্ম কি রকম পরিবর্তিত হয়, সেই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

প্লাজমা টর্চ, প্লাজমা জেট, প্লাজমা বুলেট

প্লাজমার ব্যবহারের ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে প্লাজমা টর্চ ও প্লাজমা জেটের কথা বলা চলে। প্লাজমা টর্চ থেকে আলোর পরিবর্তে উষ্ণ প্লাজমা নির্গত হয়। প্লাজমা জেট থেকে নিঃসৃত প্লাজমার উষ্ণতা আরো বেশি। রাসায়নিক দহন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত অগ্নিশিখার উর্ধ্বতম উষ্ণতা যেখানে ৫,৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, প্লাজমা জেট থেকে নির্গত প্লাজমার উষ্ণতা সেখানে প্রায় ৩০,০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেজন্যে ধাতব পদার্থের সঙ্গে সেরামিক যুক্ত করা, অত্যন্ত অল্প সময়ে ইস্পাত কেটে ফেলা প্রভৃতি নানা রকম কাজে প্লাজমা জেটের ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশের ট্রম্বেতে অবস্থিত পারমাণবিক শক্তি সংস্থার কারিগরী পদার্থবিদ্যা বিভাগ প্লাজমা টর্চ নির্মাণে সাফল্য অর্জন করেছেন। পরে তাঁরা একটি শক্তিশালী প্লাজমা জেটও তৈরি করেছেন।

দুর্গাপুরের সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিট্যুটেও এই বিষয়ে কাজ হয়েছে।

তথাকথিত প্লাজমা বন্দুক থেকে যে প্লাজমা বুলেট নিক্ষিপ্ত হয়, তার গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ঐ বুলেটের আকৃতির পরিবর্তন হয়; তখন এদের বলা হয় প্লাস্‌ময়েড। কয়েকটি প্লাস্‌ময়েডের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সেগুলির এমন আকৃতি হয়েছে, যার সঙ্গে মহাকাশের অনেক গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র-জগতের আকৃতির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে (আর্ট প্লেটে ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, প্লাস্‌ময়েড সম্পর্কিত গবেষণা থেকে নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টি-রহস্যের হয়তো একটা হদিস পাওয়া যাবে।

প্লাজমার অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটন

কোন মানুষের দেহ সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে গেলে যেমন তার দেহের ভিতর কোথায় কী হচ্ছে তা জানা দরকার, যে-কোন প্লাজমা সম্পর্কেও তেমনি একই কথা প্রযোজ্য সংযোজন চুল্লী নির্মাণের ব্যাপারে বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিফল হয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্লাজমাকে ঠিক মত নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানতে হবে। প্লাজমার মধ্যে বিদ্যুচ্চাপের মাত্রা, বিভিন্ন ধরনের কণার সংখ্যা ও গতিবিধি, সেখানে কোন তরঙ্গের উৎপত্তি ও পরিবর্ধন হয়েছে কিনা প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণ করবার জন্যে তাঁরা নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আমাদের দেশের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, শিলিগুড়ির নিকট অবস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই শহরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজপুতানার যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের কিছু কিছু গবেষণার কাজ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্লাজ্মা সম্বন্ধে তত্ত্বগত গবেষণাতেও আমাদের দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী নিযুক্ত আছেন। তবে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে প্লাজমার যে সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে অগ্রসর দেশগুলিতে যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের প্লাজমা সম্পর্কিত গবেষণার ধারাগুলিকে আরও সুপুষ্ট ও শক্তিশালী করবার দিকে মনোযোগ দেওয়া একান্তই আবশ্যক বলে মনে হয়।

সংযোজন চুল্লী : অফুরন্ত শক্তির উৎস

বর্তমানে যে সব বিষয় নিয়ে জোর কদমে গবেষণা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছে 'ফিউশান রিঅ্যাক্টর' অর্থাৎ নিউক্লীয় সংযোজন চুল্লী। এই চুল্লী তৈরির চেষ্টা সফল হলে বিদ্যুৎ-শক্তি এত প্রচুর পরিমাণে এবং সম্ভবতঃ এত সস্তায় পাওয়া যাবে যে, আধুনিক শক্তি-নির্ভর সভ্যতার অগ্রগতির হার অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি বেড়ে যাবে, প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হবে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা।

সংযোজন চুল্লীর মূল জ্বালানী ডয়টেরিয়াম সমুদ্রের জল থেকে পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলের পরিমাণ প্রায় অফুরন্ত হওয়ায় ডয়টেরিয়ামের মজুদও বলতে গেলে অফুরন্ত! আবার, এক বালতি জলের ডয়টেরিয়াম থেকে যতখানি শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তা ২ টন কয়লার শক্তির সমান। পৃথিবীর বুকে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানী এবং নিউক্লীয় বিভাজন চুল্লীর মূল জ্বালানী ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় যা আছে, মানুষের সভ্যতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে কয়েক দশকের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সংযোজন চুল্লীর জ্বালানী কয়েক শ' কোটি বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই—এই চুল্লীকে সেজন্যে কার্যতঃ অফুরন্ত শক্তির উৎস বলা যায়।

নিউক্লীয় সংযোজন

আমরা জানি, প্রত্যেক পরমাণুর মাঝখানে আছে অতি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস, যার ব্যাস পরমাণুর ব্যাসের লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভর বিভিন্ন। দুটি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা নিউক্লিয়াস জুড়ে গিয়ে নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় নিউক্লীয় সংযোজন (Nuclear fusion)। এই প্রক্রিয়ায় যে দুটি নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়, তাদের মোট ভরের তুলনায় নতুন নিউক্লিয়াসটির ভর সামান্য কিছুটা কম। এই হারিয়ে-যাওয়া ভর আসলে প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একটি বিখ্যাত সমীকরণ অনুযায়ী এই শক্তি E হচ্ছে mc^2-এর সমান, যেখানে m হারিয়ে যাওয়া ভর ও c আলোর গতিবেগ—সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এখন, c^2-এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় ভর m সামান্য হলেও E হয় সুবিপুল। মাত্র এক গ্র্যাম ভর থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাতে এক হাজারটি ১০০ ওয়াটের বাল্‌বকে ৩০ বছর একনাগাড়ে জ্বালিয়ে রাখা যায়।

প্রকৃতির রাজ্যে

প্রকৃতির রাজ্যে নিউক্লীয় সংযোজন অহোরাত্র ঘটছে। আমাদের সুপরিচিত সূর্য প্রকৃতিজাত একটি সংযোজন চুল্লী। এই চুল্লীতে প্রতিনিয়ত যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে হাইড্রোজেনের সংযোজন। হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস হল একটি প্রোটন কণা। চারটি প্রোটন জুড়ে গেলে তৈরি হয় হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস। সূর্যে এই সংযোজন দু'ধরনের প্রক্রিয়ায় হতে পারে। একটি প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রোটন-প্রোটন শৃঙ্খল (Proton-proton chain)। অন্যটিকে বলে কার্বন চক্র (Carbon cycle)। প্রথম প্রক্রিয়ার গোড়ার ধাপে দুটি প্রোটন একত্র জুড়ে যায়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় কার্বনের সহায়তায় সংযোজন ত্বরান্বিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সংযোজনের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। সূর্যে প্রতি সেকেণ্ডে সংযোজন প্রক্রিয়ায় ৬৫ কোটি ৭০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন ৬৫ কোটি ২৫ লক্ষ টন হিলিয়ামে পরিণত

হচ্ছে, আর বাকি ৪৫ লক্ষ টন ভর থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে এই থেকে যে—সারা পৃথিবীতে সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পাওয়া যায়, তা ঐ শক্তির ২০০ কোটি ভাগের মাত্র ১ ভাগ। কেবল সূর্যেই নয়, অন্যান্য বহু নক্ষত্রেও হাইড্রোজনের সংযোজন নিয়তই বিপুল শক্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে. সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসই ধনাত্মক আধানযুক্ত অর্থাৎ একই ধরনের বিদ্যুৎসম্পন্ন। এজন্যে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। নিউক্লীয় সংযোজন ঘটাতে হলে এই বিকর্ষণকে অতিক্রম করে তাদের খুব কাছাকাছি আসতে হবে। নাক্ষত্রিক পরিবেশে এটা সম্ভব হয় অত্যধিক উষ্ণতার ফলে। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতা ১,৪০,০০০০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস। এই রকম উষ্ণতায় প্রথমতঃ পদার্থের পরমাণুগুলি দ্রুত সঞ্চরণশীল হয় এবং তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে তাদের ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের বাঁধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এইভাবে বহু নিউক্লিয়াস ও মুক্ত ইলেকট্রনের যে সমাবেশ গড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় প্লাজমা। এই প্লাজমা অতি উষ্ণ হওয়ায় তার ভিতরের নিউক্লিয়াসগুলি অত্যন্ত গতিশীল; এই গতির ফলেই তাদের অনেকগুলি পারস্পরিক বিকর্ষণকে কাটিয়ে উঠে পরস্পরের খুব কাছে আসে এবং তখন নিউক্লীয় সংযোজন ঘটে থাকে।

হাইড্রোজেন বোমায়

হাইড্রোজেন বোমার ভয়ঙ্কর শক্তির কথা আমরা সকলেই শুনেছি। এই বোমার যে শক্তি, তা উৎপন্ন হয় নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়ায়। তবে সাধারণ হাইড্রোজেন নয়, এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামকে কাজে লাগানো হয়। সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস যেখানে একটিমাত্র প্রোটন দিয়ে গঠিত, ডয়টেরিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস ডয়টেরনে সেখানে একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রনও বর্তমান। ট্রিটিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস ট্রাইটনে

রয়েছে একটি প্রোটনের সঙ্গে দুটি নিউট্রন (১নং চিত্র)। প্রোটন হল ধনাত্মক আধানযুক্ত, আর নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ।
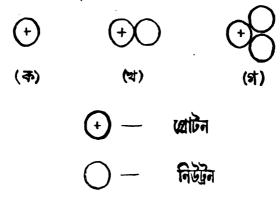
১নং চিত্র—হাইড্রোজেনের আইসোটোপগুলির নিউক্লিয়াস
(ক) সাধারণ হাইড্রোজেন, (খ) ডয়টেরিয়াম, (গ) ট্রিটিয়াম

হাইড্রোজেন বোমার ভিতরে প্রথমতঃ একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অত্যধিক উষ্ণতার সৃষ্টি করা হয়। তারপর সেই উষ্ণতায় বোমার ভিতরের ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটলে হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে।

গবেষণাগারে

বর্তমান শতাব্দীর বিশের ও তিরিশের দশকে বিজ্ঞানীরা কণা-ত্বরায়ক যন্ত্র (Particle accelerator) ব্যবহার করে গবেষণাগারে নিউক্লীয় সংযোজন ঘটাতে পেরেছিলেন। এই যন্ত্রে প্রোটন বা অন্য হাল্‌কা নিউক্লিয়াসকে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তা দিয়ে কোন লক্ষ্য-বস্তুকে আঘাত করলে তার সঙ্গে ঐ বস্তুর ভিতরের হাল্‌কা নিউক্লিয়াসের সংযোজন ঘটে এবং সংযোজন-জনিত শক্তির উদ্ভব হয়। তবে এই প্রক্রিয়ায় কয়েকটি নিউক্লিয়াসের সংযোজন থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খরচ হয় প্রক্রিয়াটি ঘটাবার জন্যে।

যদি উদ্বৃত্ত শক্তি পেতে হয়, তবে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে নিউক্লীয় সংযোজন একবার চালু করে দিলে তা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটতে থাকবে। অল্প সময়ের জন্যে এটা ঘটে হাইড্রোজেন বোমায়, কিন্তু মানুষের কল্যাণকর কাজে ব্যবহারের জন্যে এই বোমার শক্তিকে পোষ মানানো দরকার। এজন্যে বিজ্ঞানীরা গত প্রায় ২০-২৫ বছর ধরে যে যন্ত্র উদ্ভাবনে উৎসুক, তার নাম নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লী (Controlled fusion reactor)।

নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লী

এই চুল্লী তৈরির জন্যে অগ্রসর দেশগুলিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। গবেষণার অনেক খুঁটিনাটি গোপনীয়তার অন্তরালে থাকলেও এ কথা বলা যায় যে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাত্ত্বিক গবেষণার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা একটু একটু করে অনেকখানি সাফল্যের দিকে এগিয়েছেন। আর কয়েক বছরের মধ্যে অন্ততঃ গবেষণাগারে সংযোজন চুল্লী তৈরির চেষ্টা সফল হবে বলে মনে হয়। ব্যাপকভাবে এর প্রয়োগ হবে সম্ভবতঃ আগামী শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে।

জ্বালানী

সংযোজন চুল্লীর মূল জ্বালানী হল ডয়টেরিয়াম—সমুদ্রের জলে যা অফুরন্ত পাওয়া যায়। এই চুল্লীতে যে নিউক্লীয় বিক্রিয়াগুলি প্রধানতঃ ঘটে, তা ২নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দুটি ডয়টেরনের মধ্যে সংঘর্ষ হলে দু'রকম ঘটনা ঘটতে পারে :—(১) একটি ডয়টেরন থেকে একটি নিউট্রন নিয়ে অন্য ডয়টেরনটি ট্রাইটনে পরিণত হয় ; এই বিক্রিয়ায় একটি প্রোটন ছাড়া পায় [২ (ক) নং চিত্র]। (২) একটি ডয়টেরন থেকে একটি প্রোটন নিয়ে অন্যটি হিলিয়াম-৩-এ পর্যবসিত হয় ; একটি নিউট্রন ছাড়া পায় এই বিক্রিয়ায় [২ (খ) নং চিত্র]। এখন যে ট্রাইটন ও হিলিয়াম-৩ উৎপন্ন হল, তাদের সঙ্গে ডয়টেরনের বিক্রিয়ায় হিলিয়াম-৪

পাওয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রে একটি নিউট্রন ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি প্রোটন ছাড়া পায় [২ (গ) ও (ঘ) নং চিত্র]। এই সব সংযোজন-বিক্রিয়াতেই শক্তির উদ্ভব হয়।
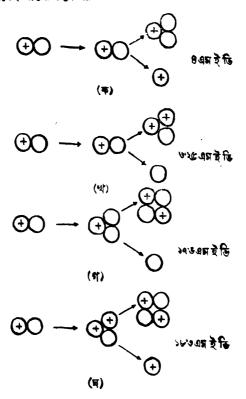
২নং চিত্র—নিউক্লীয় সংযোজন চুল্লীতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া। যে বিক্রিয়ায় যতখানি শক্তি উৎপন্ন হয়, তা তার ডানদিকে লেখা হয়েছে ; ১ এম ই ভি হল ১ মেগা (দশ লক্ষ) ইলেকট্রন ভোল্ট। (১ ভোল্ট বিভব-পার্থক্য থেকে একটি ইলেকট্রন যতখানি শক্তি পায়, তাই হচ্ছে ১ ইলেকট্রন ভোল্ট)।

দুটি ডয়টেরনের সংযোজনের চেয়ে একটি ডয়টেরন ও একটি ট্রাইটনের সংযোজন ঘটে অপেক্ষাকৃত সহজে। এজন্যে চুল্লীতে কেবল ডয়টেরিয়ামকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার না করে ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মিশ্রণকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবারও পরিকল্পনা রয়েছে। তবে প্রকৃতিতে ট্রিটিয়াম সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এটিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা দরকার। যদি চুল্লীকক্ষের মধ্যে প্রথমে ডয়টেরিয়ামের সঙ্গে কিছু ট্রিটিয়াম রাখা যায় এবং চুল্লীকক্ষকে ঘিরে থাকে লিথিয়ামের স্তর, তাহলে ডয়টেরনের সঙ্গে ট্রাইটনের বিক্রিয়ায় যে সব নিউট্রন ছাড়া পায়, লিথিয়ামের সঙ্গে তাদের বিক্রিয়ায় ট্রিটিয়াম ও হিলিয়াম-৪ উৎপন্ন হয়। এই ট্রিটিয়ামকে এবার চুল্লীকক্ষে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা যায়। পৃথিবীতে লিথিয়াম সুলভ হওয়ায় এইভাবে চুল্লীতে ট্রিটিয়ামের সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব।

দুটি প্রয়োজনীয় শর্ত

সার্থক সংযোজন চুল্লী তৈরি করতে হলে তার জ্বালানীর উষ্ণতা খুব বেশি হওয়া দরকার। এই উষ্ণতায় জ্বালানীর সব অণু-পরমাণু ভেঙে গিয়ে যে কেবল প্লাজমা অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা নয়, সেই প্লাজমার ভিতরের নিউক্লিয়াসগুলি এত দ্রুত ঘোরাফেরাও করে যে, তারা পারস্পরিক বিকর্ষণ কাটিয়ে পরস্পরের খুব কাছে চলে আসে এবং তাদের সংযোজন ঘটে। প্লাজমা যথেষ্ট উষ্ণ হলে তার মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে নিউক্লীয় সংযোজনের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, সংযোজনের ফলে উদ্ভূত শক্তি প্লাজমা থেকে বিকিরণের ফলে বিনষ্ট শক্তির চেয়ে বেশি হয় এবং সেই প্লাজমা থেকে উদ্বৃত্ত শক্তি পাওয়া যেতে পারে। সংযোজন চুল্লীর জ্বালানী ডয়টেরিয়াম হলে সেই চুল্লীর সাফল্যের প্রথম শর্ত : উষ্ণতা অন্ততঃ ৪০ কোটি ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস হওয়া দরকার। যদি এই জ্বালানী ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মিশ্রণ হয়, তবে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা ১০ কোটি ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস। এই সব উষ্ণতার কাছে সূর্যের

কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতাও হার মেনে যায়।

এই প্রচণ্ড রকম উষ্ণ প্লাজমা উৎপন্ন করা যদি বা সম্ভব, তাকে একত্র ধরে রাখা এক মহা-সমস্যা। আবার প্লাজমার মধ্যে কণার সংখ্যা যত বেশি হয়, ততই উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয় বলে প্লাজমার স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু সংযোজন চুল্লীর সাফল্যের জন্যে প্লাজমায় নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ও প্লাজমার স্থায়িত্বকাল—এ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিউক্লিয়াসের সংখ্যা বেশি হলে তবেই না যথেষ্ট পরিমাণে নিউক্লিয়াস সংযোজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে! আবার এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, প্লাজমা যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা থেকে তত বেশি শক্তি সংগ্রহ করা চলবে। বস্তুতঃ সংযোজন চুল্লীর সাফল্যের দ্বিতীয় শর্ত হল : $n \times t$-এর মান একটি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে বেশি হবে, যেখানে n প্লাজমার প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা ও t সেকেণ্ড প্লাজমার স্থায়িত্বকাল। বিজ্ঞানী লসনের নামানু-সারে এই শর্তটিকে বলা হয় 'লসনের শর্ত'। চুল্লীতে জ্বালানী কেবল ডয়টেরিয়াম হলে $n \times t$-এর সর্বনিম্ন মান $১০^{১৬}$। যদি জ্বালানী ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মিশ্রণ হয়, তবে এই মান $১০^{১৪}$।

গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা

চৌম্বক পিঞ্জরের ব্যবহার :—ইংল্যাণ্ডের জিটা, অ্যামেরিকার স্টেলারেটর, রাশিয়ার ওগ্রা প্রভৃতি যন্ত্রে সংযোজন চুল্লীর উপযোগী প্লাজমা তৈরির জন্যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। বারবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলেছেন বিজ্ঞানীরা। বর্তমানে যা সবচেয়ে আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে, তা হল রাশিয়ার টোকাম্যাক যন্ত্রের ধারণা। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য দেশেও এই ধরনের যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এই যন্ত্রে একটি প্রকাণ্ড বলয়াকৃতি ফাঁপা ধাতব নলের মধ্যে অত্যুত্তপ্ত প্লাজমার সৃষ্টি করা হয় বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ কয়েক লক্ষ অ্যামপীয়ার, তবে তার অস্তিত্ব অবশ্য এক

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র সময়ের জন্যে। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত ট্র্যান্স-ফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের ফলে ধাতব নলের ভিতরে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয় ও সৃষ্টি হয় উষ্ণ প্লাজমার। কয়েক রকম অতিরিক্ত উপায়ে এই প্লাজমাকে আরও উষ্ণ করে তোলা যায়। সেই প্লাজমা যদি যথেষ্ট সময় স্থায়ী হয়, তাহলে লসনের শর্ত পালিত হতে পারে, কিন্তু ঐ প্লাজমা আধারের দেয়ালের সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গেই উষ্ণতা হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। এজন্যে আধারের অন্তস্তলে প্লাজমাকে আবদ্ধ
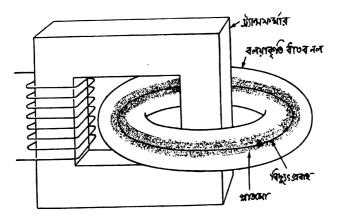
৩নং চিত্র—বলয়াকৃতি ধাতব নলের মধ্যে অত্যুত্তপ্ত প্লাজমার সৃষ্টি

রাখবার চেষ্টা করা হয় এক অদৃশ্য চৌম্বক পিঞ্জরে। চুম্বকক্ষেত্র দিয়ে এই পিঞ্জর তৈরি—বিশেষ ব্যবস্থায় উৎপন্ন চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে প্লাজমা নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে আসতে পারবে না, এই আশা। টোকাম্যাকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এতে ব্যবহৃত হয় বিশেষ ধরনের চৌম্বক পিঞ্জর। জিটা, স্টেলারেটর প্রভৃতি যন্ত্রেও চৌম্বক পিঞ্জর ছিল, তবে টোকাম্যাকের পিঞ্জর অনেক বেশি সুদৃঢ়—আগেকার তুলনায় অনেক বেশি সময় এর মধ্যে উষ্ণ প্লাজমাকে ধরে রাখা গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের টি-৩ নামক টোকামাক যন্ত্রে ১ কোটি ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস উষ্ণতায় প্লাজমাকে ১০ মিলিসেকেণ্ড (অর্থাৎ ১/১০০ সেকেণ্ড) ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল ; এই প্লাজমায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে আয়নের সংখ্যা ছিল ৩ × ১০¹³। ১৯৬৯ সালে যখন এই ঘটনা প্রচারিত হয়, তখন অন্যান্য যন্ত্রে অনুরূপ প্লাজমার সঙ্গে স্থায়িত্ব-কালের প্রতিযোগিতায় এটি ছিল একটি বিশ্ব-রেকর্ড। এই যন্ত্রের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা টি-১০ ও টি-২০ নামে আরো বড় দুটি যন্ত্র তৈরির কাজে লেগে গেছেন। টি-১০ যন্ত্রটিকে ১৯৭৫ সালে আংশিকভাবে চালানো হয়েছিল। এই যন্ত্রের চেয়েও তিনগুণ বড় হবে টি-২০।

চৌম্বক পিঞ্চের ব্যবহার করে অন্যান্য দেশে যে সব যন্ত্র তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—অ্যামেরিকার অ্যাল্‌কাটার, পি এল টি ও পি ডি এক্‌স্‌, জাপানের জে টি-৬০, পশ্চিম জার্মানীর অ্যাস্‌ডেক্স এবং ইতালির টোকাম্যাক এফ টি। অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা এমন সংযোজন চুল্লীর পরিকল্পনা করেছেন, যার উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১,০০০ মেগাওয়াট।

সাম্প্রতিক খবরে (অগাস্ট ১৯৭৮) প্রকাশ, প্রিন্সটন লার্জ টোরাস (পি এল টি) যন্ত্রে ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম প্লাজমার উষ্ণতাকে ৬ কোটি ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস পর্যন্ত তোলা সম্ভব হয়েছে। এর আগে সর্বাধিক উষ্ণতার রেকর্ড ছিল ২½ কোটি ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস। এ পর্যন্ত সংযোজন চুল্লীর প্লাজমায় $n \times t$-এর যে সর্বোচ্চ মান পাওয়া গেছে, লসনের শর্ত পালিত হওয়ার জন্যে তার আর মাত্র ১০ গুণের মত বেশি হওয়া দরকার।

লেসারের প্রয়োগ :—সম্পূর্ণ পৃথক এক ব্যবস্থায় সংযোজন চুল্লী তৈরির জন্যেও জোর চেষ্টা চলেছে। এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ডয়টেরিয়াম-ট্রিটিয়াম (সংক্ষেপে ডি-টি) খণ্ডের উপর লেসার যন্ত্রের শক্তি-শালী রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। ঐ মিশ্রণ নিমেষের মধ্যে উত্তপ্ত প্লাজমায়

রূপান্তরিত হয় এবং প্রথমে সংকোচনের ফলে তার ঘনত্ব যায় খুব বেড়ে। অবশ্য সামান্য সময় পরেই প্লাজমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে প্লাজমার স্থায়িত্ব-কাল মোটামুটিভাবে $১০^{-৯}$ সেকেণ্ড। প্লাজমার একত্র সমাবেশ সামান্য সময়ের জন্যে হলেও তার ঘনত্ব খুব বেশি হওয়ায় লসনের শর্ত পালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরীক্ষায় কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর খুব অল্প সময়ের জন্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী রশ্মিগুচ্ছ সৃষ্টি করা হয়। এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে একটি ডি-টি খণ্ডের উপর প্রথম রশ্মিগুচ্ছ পড়ে উত্তপ্ত প্লাজমা উৎপাদনের কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় রশ্মিগুচ্ছ এসে পড়ে আর একটি ডি-টি খণ্ডের উপর। এইভাবে পরপর রশ্মিগুচ্ছের সাহায্যে ক্রমাগত উষ্ণ প্লাজমা তৈরি হয়ে সংযোজন প্রক্রিয়া চলতে পারে।

লেসার সংক্রান্ত পরীক্ষায় অনেক সময় কয়েকটি লেসারের রশ্মি-গুচ্ছকে ডি-টি খণ্ডের উপর সংহত করে রশ্মির মোট তীব্রতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ৯টি লেসার ব্যবহার করে এই ধরনের পরীক্ষা সর্বপ্রথম করা হয়েছিল বছর সাতেক আগে মস্কোর লেবেডেভ ইনস্টিট্যুটে। পরে অ্যামেরিকা ও ফ্রান্সেও এইরকম পরীক্ষা হয়েছে।

ইলেকট্রনগুচ্ছ ও আয়নগুচ্ছের প্রয়োগ :—লেসার রশ্মির পরিবর্তে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুচ্ছকে ডয়টেরিয়ামের (বা ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের) ক্ষুদ্র খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করেও সংযোজন চুল্লীর উপযোগী প্লাজমা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। এই গুচ্ছের দ্রুত গতিবেগ আলোর গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় হওয়ায় একে বলা হয় আপেক্ষিকতাসম্পন্ন ইলেকট্রনগুচ্ছ (Relativistic electron beam), সংক্ষেপে আর ই বি (REB), কারণ এই গুচ্ছের ইলেকট্রনগুলির ধর্ম নির্ধারিত হয় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে। অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে ইলেকট্রনের পরিবর্তে শক্তিশালী আয়নগুচ্ছকে একই ভাবে উত্তপ্ত প্লাজমা তৈরির কাজে ব্যবহার করবার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় লেসার রশ্মি সৃষ্টির চেয়ে ইলেকট্রনগুচ্ছ বা আয়ন

গুচ্ছের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে সম্ভব।

সংক্ষেপে বলা যায়, সংযোজন চুল্লী তৈরির জন্যে গত দশ-বারো বছর ধরে বিজ্ঞানীরা নানারকম নতুন নতুন ধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অ্যামেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে এই উদ্দেশ্যে গবেষণা খাতে ব্যয় বেশ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে

আমাদের দেশে সংযোজন চুল্লী তৈরির কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। আগামী দু-এক বছরের মধ্যে যদি আমরা এ ব্যাপারে উদ্যোগী না হই, তাহলে আমাদের দূরদর্শিতার অভাবই ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে, কারণ অগ্রসর দেশগুলিতে যে জোর কদমে কাজ চলছে, তাতে সংযোজন চুল্লী তৈরির প্রচেষ্টা কয়েক বছরের মধ্যে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং তখন এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ পর-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

সব দিক বিবেচনা করে মনে হয়, সংযোজন চুল্লীর ব্যাপারে আমাদের দেশে টোকাম্যাক ধরনের যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা প্রথমে নেওয়া উচিত। এই যন্ত্রে কিভাবে অতি উষ্ণ প্লাজমা সৃষ্টি করা যায়, সেই প্লাজমার অস্থায়িত্বের (instability) কারণ কী কী, ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করা যেতে পারে। আমাদের বেশ কয়েকটি গবেষণা-কেন্দ্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্লাজমা সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কলকাতার সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বোম্বাইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র, দিল্লীর ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি, আমেদাবাদের ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। প্লাজমা ব্যবহার করে ম্যাগ্‌নেটো-হাইড্রোডাইন্যামিক জেনারেটর (সংক্ষেপে এম এইচ ডি জেনারেটর) নামে যে আধুনিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, সেইরকম একটি যন্ত্র

নির্মাণের জন্যে কিছুদিন আগে বোম্বাইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সংযোজন চুল্লীর প্লাজমা সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে পূর্বাঞ্চলের কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি প্রকল্প কি এখন শুরু করা যায় না?

এম এইচ ডি জেনারেটর ঃ
বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থা

আধুনিক সভ্যতা যে কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিদ্যুৎ-শক্তি তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। আমাদের ঘরে-বাইরে, দোকানে-অফিসে, কলে-কারখানায় সর্বত্রই এর অজস্র ব্যবহার। আলো, পাখা থেকে শুরু করে হিটার, রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, সিনেমা, শিল্প—কোথায় না বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে! শিল্প-বিপ্লবের সময় যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যুগান্তর এনেছিল, বিদ্যুচ্চালিত ইঞ্জিনের কাছে নতি স্বীকার করে তাকে তার জন্মভূমি বৃটেন থেকে তো সম্পূর্ণ বিদায়ই নিতে হয়েছে।

এই যে অঘটন-ঘটনপটিয়সী বিদ্যুৎ-শক্তি, একে কিন্তু আমরা সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাই না। কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তি, জলের গতীয় শক্তি অথবা ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের নিউক্লীয় শক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে আমরা এই শক্তি পেয়ে থাকি। এই রূপান্তরের সময় বেশ খানিকটা শক্তির অপচয় ঘটে। সেইজন্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ শক্তির উৎস থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা বেশ কিছুটা কম হয়ে থাকে। শক্তির এই দুটি পরিমাণের অনুপাতকে বলা হয় শক্তি-রূপান্তর ব্যবস্থার এফিসিয়েন্সি বা কার্যকারিতা এবং একে সাধারণতঃ শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যদি আমরা বলি কোন ব্যবস্থার কার্যকারিতা শতকরা ৩০ ভাগ, তাহলে বোঝা যাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ হচ্ছে উৎস থেকে নির্গত শক্তির ১০০ ভাগের ৩০ ভাগ; এক্ষেত্রে বাকি ৭০ ভাগ শক্তি নানাভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তাকে কাজে লাগানো যায় না।

বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সাধারণ ব্যবস্থা ও এম এইচ ডি জেনারেটর

শক্তি রূপান্তরের অর্থাৎ অন্য রকম শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে আধুনিক যে ব্যবস্থা, সেইটিই এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়। কিন্তু সেই আলোচনার আগে দেখা যাক, এই শক্তি উৎপাদনের সাধারণ ব্যবস্থাটা কী। থার্মাল ডি সি জেনারেটর বা তাপ-পরিচালিত সমপ্রবাহ বিদ্যুৎ-উৎপাদন ব্যবস্থার কথাই ধরা যাক। যখন কোন জ্বালানীকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তার তাপের সাহায্যে প্রথমে বয়লারে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয় ; ঐ বাষ্পের উষ্ণতা যথেষ্ট বেশি হয়ে থাকে। এইবার ঐ বাষ্পকে টার্বাইন নামক যন্ত্রে প্রবেশ করানো হলে উত্তপ্ত বাষ্পের চাপে টার্বাইনের ভারী অক্ষ-দণ্ডটি ঘুরতে থাকে, অর্থাৎ টার্বাইনে বাষ্পের তাপশক্তি দণ্ডটির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার ঐ দণ্ডের অন্য দিক জেনারেটর নামক যন্ত্রের আর্মেচারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় দণ্ডটি ঘুরলে আর্মেচারও ঘোরে। আর্মেচারে বিদ্যুৎ-পরিবাহী তামার তার অনেকগুলি কুণ্ডলীর আকারে সাজানো থাকে এবং জেনারেটরের বাইরের দিকে যে চুম্বক থাকে (যাকে বলা হয় ক্ষেত্র চুম্বক), সেটি জেনারেটরের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে আর্মেচার ঘুরতে থাকলে তার তারের কুণ্ডলীতে ভোল্টেজ বা বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত পদ্ধতিতে আর্মেচারের বিদ্যুচ্চাপ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণ করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জেনারেটরে যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই যে প্রক্রিয়া, এর মূল নীতিটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন। মূল নীতিটি হল এই যে, কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারের কুণ্ডলী গতিশীল হলে ঐ কুণ্ডলীতে বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হয়। আবার

যদি তারের কুণ্ডলী স্থির থাকে কিন্তু চুম্বক সরিয়ে কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রকে গতিসম্পন্ন করা যায়, তাহলেও আমরা বিদ্যুচ্চাপ পেতে পারি। অর্থাৎ তারের কুণ্ডলী ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকলে কুণ্ডলীতে বিদ্যুচ্চাপ উৎপন্ন হয়। একে বলা হয় বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic induction)। কথিত আছে, ফ্যারাডের এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তাঁর পরীক্ষায় বিদ্যুচ্চাপ উৎপন্ন করে লাভটা কী? ফ্যারাডে উত্তর দেন—লাভ এই যে, এর উপর আপনি একদিন ট্যাক্স বসাতে পারবেন। ফ্যারাডের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি আজ উৎপন্ন হচ্ছে, তার উপর বিভিন্ন দেশের সরকারের ট্যাক্সের পরিমাণ সত্যই কম নয়!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রচলিত অধিকাংশ ব্যবস্থায় সমপ্রবাহ (ডি সি) বিদ্যুতের পরিবর্তে পরিবর্তী-প্রবাহ (এ সি) বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি মূলতঃ একই রকম, কেবল জেনারেটরের গঠন কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এই জেনারেটরকে বলা হয় অল্টার্নেটর।

টার্বাইন ও অল্টার্নেটর সমন্বিত যে উৎপাদন ব্যবস্থা, তার নানাবিধ উন্নতি করে তার কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে বর্তমানে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত করা গেছে। এর কার্যকারিতাকে আরো বেশি বাড়ানোর সম্ভাবনা বর্তমানে কম বলেই মনে হয়। কিন্তু কার্যকারিতা বাড়াতে পারলে একই শক্তির উৎস ব্যবহার করে বেশি বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে। এখন কার্যকারিতা বাড়ানো যায় কিভাবে?

এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা একেবারে নতুন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। যন্ত্রটির নাম ম্যাগ্নেটো-হাইড্রোডাইন্যামিক জেনারেটর। ম্যাগ্নেটো, হাইড্রো ও ডাইন্যামিক, এই তিনটি ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর M, H ও D নিয়ে এই যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়েছে এম এইচ

এখন আমরা আলোচনা করবো।

এম এইচ ডি জেনারেটরে প্লাজমার ব্যবহার

সাধারণ ডি সি জেনারেটরে যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে তারের কুণ্ডলীকে অর্থাৎ বিদ্যুৎ-পরিবাহী কঠিন পদার্থকে গতিসম্পন্ন করা হয়, এম এইচ ডি জেনারেটরে সেখানে কঠিন পদার্থের পরিবর্তে বিদ্যুৎ-পরিবাহী কোন গ্যাসীয় পদার্থকে গতিশীল করবার ব্যবস্থা থাকে। আসলে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়—যে-কোন অবস্থাতেই পদার্থ থাকুক, তা যদি বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয়, তাহলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে তার গতির ফলে বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হবে। তবে আমরা জানি, গ্যাস সাধারণতঃ অপরিবাহী। যদি কোন বস্তুর মধ্যে বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত বস্তুকণা মুক্ত অবস্থায় থাকে, তবেই সেই সব বস্তুকণা বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে অর্থাৎ বস্তুটি পরিবাহী হয়। গ্যাসের মধ্যে ঐ রকম মুক্ত বস্তুকণা নেই, আছে নিরপেক্ষ অণু-পরমাণু। এই গ্যাসকে যদি ভালভাবে আয়নিত করা যায় অর্থাৎ তার বেশ অনেকগুলি অণু-পরমাণু যদি ভেঙে গিয়ে ধনাত্মক আয়ন ও ঋণাত্মক ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়, তাহলে গ্যাসটি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজমায় রূপান্তরিত হয়। প্লাজমার মধ্যে বন্ধনমুক্ত আয়ন ও ইলেকট্রন থাকায় প্লাজমা বিদ্যুৎ-পরিবাহী।

এই প্লাজমার উষ্ণতা প্রায় ২০,০০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস করা হলে তাতে আর বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অণু-পরমাণু থাকে না, সবগুলিই আয়ন ও ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়। কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানী থেকে বা পারমাণবিক চুল্লী থেকে যে উত্তপ্ত গ্যাস প্লাজমা অবস্থায় এম এইচ ডি যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়, তার উষ্ণতা সাধারণতঃ ২,০০০ থেকে ৩,০০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস হওয়ায় তার মধ্যে ইলেকট্রন ও আয়নের সংখ্যা খুব বেশি হয় না; সেইজন্যে তার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যথেষ্ট

নয়। এই পরিবাহিতা বাড়ানোর জন্যে ঐ প্লাজমার সঙ্গে শতকরা প্রায় ১ ভাগ পটাসিয়াম বা সিজিয়াম বা ঐ ধরনের এমন কোন পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া হয়, যা সহজেই আয়নিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সীডিং (Seeding) বা বীজ বপন। কারণ প্লাজমায় ঐ পদার্থের পরমাণু থাকবার ফলেই ইলেকট্রন-আয়ন সৃষ্টির ব্যাপারে প্লাজমা বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে।

এম এইচ ডি জেনারেটর ও তার কার্যকারিতা

এম এইচ ডি যন্ত্রে এই বীজসমেত প্লাজমাকে একটি প্রশস্ত নলের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় (১নং চিত্র)। ঐ নলের বাইরে চুম্বক

১নং চিত্র—এম এইচ ডি জেনারেটর
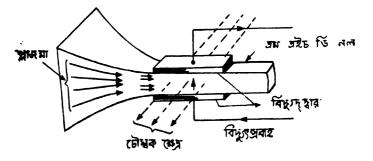
রেখে এমন ভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় যে, তা ঐ প্লাজমার গতির সঙ্গে সমকোণ করে থাকে। নলের ভিতরের গাত্রে দুটি বিদ্যুদ্‌দ্বার উপযুক্ত স্থানে সংলগ্ন থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে পরিবাহী প্লাজমার গতির ফলে দুটি বিদ্যুদ্‌দ্বারের মধ্যে বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-শক্তি সহজেই আহরণ করা চলে। প্লাজমা বিদ্যুৎ-পরিবাহী হওয়ায় এক্ষেত্রে টার্বাইনের প্রয়োজন হয় না, প্লাজমার তাপশক্তি সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে

রূপান্তরিত হয়। টার্বাইনের অক্ষদণ্ডের মত কোন গতিশীল কঠিন বস্তু এম এইচ ডি যন্ত্রে প্লাজমার সংস্পর্শে থাকে না এবং ঐ যন্ত্রের নলের গাত্রকে বাইরে থেকে ঠাণ্ডা রাখবার ব্যবস্থা করা যায়। এজন্যে এই যন্ত্রে ব্যবহৃত প্লাজমার উষ্ণতা সাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত গ্যাসের উষ্ণতার তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। ঐ গ্যাসের সর্বাধিক উষ্ণতা যেখানে প্রায় ৬০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস, এম এইচ ডি যন্ত্রে প্লাজমার উষ্ণতা সেখানে ২,০০০ থেকে ৩,০০০ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস। এই সব কারণে এম এইচ ডি যন্ত্রের কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। এই কার্যকারিতার পরিমাণ বর্তমানে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ; ভবিষ্যতে হয়তো তা শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। ফলে সমান পরিমাণ জ্বালানী ব্যবহার করে সাধারণ উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনায় এম এইচ ডি ব্যবস্থায় প্রায় দেড়গুণ বা দু'গুণ বেশি শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

এম এইচ ডি জেনারেটরের আকার বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহলে শক্তি উৎপাদনের গড় ব্যয় কমে যায়। আবার এ যন্ত্রে চৌম্বক ক্ষেত্রও প্রবল হওয়া দরকার। এজন্যে এতে এমন শক্তিশালী অতিপরিবাহী চুম্বক ব্যবহৃত হচ্ছে, যার চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ বেশ কয়েক টেস্‌লা (১ টেস্‌লা = ১০,০০০ গাউস)।

বিভিন্ন ধরনের এম এইচ ডি জেনারেটর

বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের বিষয়ে মাইকেল ফ্যারাডের যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উৎপাদক যন্ত্রে কঠিন পরিবাহীর পরিবর্তে গ্যাসীয় পরিবাহী ব্যবহারের উপযোগিতা একশ' বছরেরও আগে ফ্যারাডে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু গ্যাসের মধ্যে যথেষ্ট পরিবাহিতা সৃষ্টি করবার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা সুযোগ-সুবিধা কোনটাই তখন ছিল না। যা হোক, এখানে যে এম এইচ ডি যন্ত্রের বর্ণনা করা হল, মাইকেল ফ্যারাডের নাম অনুযায়ী তাকে ফ্যারাডে

জেনারেটর বলা হয়ে থাকে। এই জেনারেটরের অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে এর কার্যকারিতা খানিকটা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়; যেমন—এর বিদ্যুদ্দ্বারকে অবিচ্ছিন্ন না রেখে দুটি বিদ্যুদ্দ্বারের প্রত্যেকটিকেই কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া আর এক ধরনের এম এইচ ডি যন্ত্র আছে, যার নলের গাত্র-সংলগ্ন দুটি বিদ্যুদ্দ্বারকে বাইরে থেকে তামার পাত বা তামার তার দিয়ে সোজাসুজি যোগ করে দেওয়া হয় এবং অন্য দুটি বিদ্যুদ্দ্বার রাখা হয় নলের মধ্যে, নলের অক্ষের সঙ্গে সমকোণ করে। এখন নলের ভিতর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্লাজমার গতির ফলে প্রথমতঃ নলের গাত্র-সংলগ্ন দুটি বিদ্যুদ্-দ্বারের মধ্যে বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হয় এবং তামার পাত বা তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে তার সঙ্গে সমকোণে এই বিদ্যুৎপ্রবাহ থাকার ফলে দ্বিতীয় জোড়া বিদ্যুদ্দ্বারের মধ্যে বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হয়। অতঃপর সেই বিদ্যুচ্চাপ থেকে উপযুক্ত কোন উপায়ে বিদ্যুৎ-শক্তি সংগ্রহ করা চলে। এই যে চৌম্বক ক্ষেত্র ও বিদ্যুৎপ্রবাহের সমন্বয়ে বিদ্যুচ্চাপের উৎপত্তি, এই প্রক্রিয়াটির আবিষ্কর্তা ই. এইচ. হল-এর নামানুসারে এই ধরনের জেনারেটরকে 'হল জেনারেটর' বলা হয়।

অতিপরিবাহী চুম্বকের ব্যবহার

এম এইচ ডি জেনারেটর যে ধরনেরই হোক, চৌম্বক ক্ষেত্রকে যত বাড়াতে পারা যায়, বিদ্যুচ্চাপও তত বাড়ে। কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রকে অত্যন্ত বাড়াতে হলে শক্তিশালী বিদ্যুচ্চুম্বকের প্রয়োজন। এই ধরনের চুম্বকের তারের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠাতে হয়। সেই তারের রোধের জন্যে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎ-শক্তি তাপে পর্যবসিত হয়। ফলে বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় তো ঘটেই, উপরন্তু বিদ্যুচ্চুম্বক যাতে না অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেজন্যে তাকে শীতল রাখবার বিশেষ আয়োজন করতে হয়। এই সব সমস্যার সমাধান হয়েছে

একটি চমকপ্রদ উপায়ে। উপায়টি হল Superconducting magnet বা অতিপরিবাহী চুম্বকের ব্যবহার। শূন্য ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস থেকে ২৭৩'২ ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস নিচে যে চরম শূন্য উষ্ণতা, সেই উষ্ণতার কাছাকাছি উষ্ণতায় কয়েকটি ধাতুর অতিপরিবাহিতা ধর্ম দেখা দেয় অর্থাৎ তখন ঐ সব ধাতুর বৈদ্যুতিক রোধ একেবারে শূন্য হয়ে যায়। এই রকম অতিপরিবাহী কোন ধাতুর তার দিয়ে যে বিদ্যুচ্চুম্বক তৈরি হয়, তাকেই বলা হয় অতিপরিবাহী চুম্বক। এম এইচ ডি যন্ত্রে প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্যে বিরাট বিরাট অতিপরিবাহী চুম্বক ব্যবহার করা হচ্ছে। অ্যামেরিকার অ্যাভকো কর্পোরেশনের এভারেট গবেষণাগারে এমন একটি অতিপরিবাহী চুম্বক তৈরি হয়েছে, যেটি ১০ ফুট দীর্ঘ এবং যাতে ব্যবহৃত অতিপরিবাহী নাইয়োবিয়াম-জার্কোনিয়াম তারের দৈর্ঘ্য ১১৭ মাইল। এই চুম্বক যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে, তার পরিমাপ হল ৪ টেস্‌লা।

সম্মিলিত উৎপাদক ব্যবস্থা

এম এইচ ডি জেনারেটর ব্যবহার করে যে সব উৎপাদক ব্যবস্থার পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে, সেগুলিতে এই জেনারেটর সাধারণতঃ এককভাবে কাজ করে না, কাজ করে টার্বাইন-অলটার্নেটরের 'উপর-ওয়ালা' (Topper) হিসাবে। ঠিক আমাদের সমাজের উপরওয়ালার মত নয় (—আমাদের উপরওয়ালারা তো শুধু দুধ থেকে সরটুকু খেতেই অভ্যস্ত), এ যেন সেই আদর্শ উপরওয়ালা, যে অন্যকে আড়ালে রেখে নিজেই প্রথমে ঝক্‌কি-ঝামেলার মোকাবিলা করে। অত্যুত্তপ্ত আয়নিত গ্যাস বা প্লাজমা প্রথমে বয়ে যায় এম এইচ ডি নলের মধ্য দিয়ে এবং সেখানে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করে। ঐ নল থেকে নির্গত গ্যাস অনেক কম উষ্ণতায় সাধারণ উৎপাদক ব্যবস্থার বয়লারের সান্নিধ্যে আসে। এই উষ্ণতা বয়লারের পক্ষে উপযোগী। বয়লারে জল বাষ্পীভূত হতে

থাকলে সেই বাষ্পকে যথারীতি একটি টার্বাইনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর টার্বাইনের সাহায্যে অল্‌টার্নেটরে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, এই ক্ষেত্রে উৎপাদক ব্যবস্থার দুটি ধাপ—প্রথম ধাপে এম এইচ ডি জেনারেটর, পরের ধাপে বাষ্পচালিত টার্বাইন ও অল্‌টার্নেটর। এই সম্মিলিত ব্যবস্থার কার্যকারিতা এম এইচ ডি জেনারেটরের একক কার্যকারিতার তুলনায় কম বটে, কিন্তু সাধারণ উৎপাদক ব্যবস্থার কার্যকারিতার তুলনায় অনেক বেশি। এর মোট কার্যকারিতা শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগের মত হতে পারে বলে মনে হয়।

এই সম্মিলিত উৎপাদক ব্যবস্থা দু' ধরনের হতে পারে। একটিকে উন্মুক্ত চক্র ব্যবস্থা ও অন্যটিকে বদ্ধ চক্র ব্যবস্থা বলা হয়।
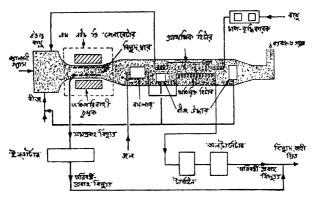
২নং চিত্র—উন্মুক্ত চক্র ব্যবস্থা

উন্মুক্ত চক্র ব্যবস্থা (Open Cycle System) :—উন্মুক্ত চক্র ব্যবস্থায় কার্যকর গ্যাস এম এইচ ডি নল ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আসবার পর তাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাকে আর কাজে লাগানো হয় না। এম এইচ ডি নলে নতুন গ্যাসই অনবরত ঢোকানো হতে থাকে।

২নং চিত্রে একটি উন্মুক্ত চক্র ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী দেখানো হয়েছে।

জ্বালানী গ্যাস উষ্ণ ও উচ্চচাপ বায়ু এবং কোন উপযুক্ত বীজের সঙ্গে মিশে প্রবেশ করে এম এইচ ডি নলে। সেখানে অতিপরিবাহী চুম্বকের উপস্থিতিতে দুটি বিদ্যুদ্‌দ্বারের মধ্যে যে বিদ্যুচ্চাপের সৃষ্টি হয়, তাই থেকে উৎপন্ন হয় সমপ্রবাহ বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ ইন্‌ভার্টারের মাধ্যমে পরিবর্তী-প্রবাহ বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। এম এইচ ডি নল থেকে নিষ্ক্রান্ত গ্যাসের তাপ ব্যবহার করে বয়লারে জল বাষ্পীভূত হয়। অতিরিক্ত হিটার ব্যবস্থায় সেই বাষ্পকে আরও উষ্ণ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় টার্বাইনে। এই বাষ্পচালিত টার্বাইনের সাহায্যে অল্‌টার্নেটরে পরিবর্তী-প্রবাহ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ এবং এম এইচ ডি জেনারেটর থেকে ইন্‌ভার্টারের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিবর্তী-প্রবাহ বিদ্যুৎকে একত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিদ্যুদ্‌বাহী গ্রিডে—যে গ্রিড থেকে আমরা প্রয়োজন মত বিদ্যুৎ-শক্তি সংগ্রহ করতে পারি।

জ্বালানী গ্যাসের সঙ্গে যে বীজ মেশানো হয়, তা মহার্ঘ হওয়ায় ব্যবহৃত গ্যাস থেকে যথাসম্ভব বীজ উদ্ধারের ব্যবস্থা থাকে। এই বীজকে সামান্য পরিমাণ নতুন বীজের সঙ্গে একত্র করে এম এইচ ডি নলে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জ্বালানী গ্যাসের সঙ্গে যে বায়ু মেশানো হয়, প্রাথমিক হিটার ব্যবস্থায় তাকে আগেই কিছুটা উষ্ণ করে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

বদ্ধ চক্র ব্যবস্থা (Closed Cycle System) :—এই ব্যবস্থায় কার্যকর গ্যাস এম এইচ ডি নল ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকে—যে গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে, তার উষ্ণতা ও চাপ বাড়িয়ে তাকেই আবার এম এইচ ডি নলে পাঠানো হয়। হিলিয়াম বা ঐ ধরনের কোন রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে কার্যকর গ্যাস হিসাবে ব্যবহার করলে গ্যাসের সঙ্গে যন্ত্রটির অংশের রাসায়নিক বিক্রিয়া এড়ানো যায় বটে, তবে সেক্ষেত্রে বদ্ধ চক্র ব্যবস্থাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। কারণ ঐ সব গ্যাস অপেক্ষাকৃত দুর্লভ ও মহার্ঘ হওয়ায় একই গ্যাসকে বারবার ব্যবহার করতে পারা সুবিধাজনক। তাপ সৃষ্টি করবার জন্যে কয়লা,

তেল প্রভৃতি ব্যবহার না করে যদি নিউক্লীয় জ্বালানী ব্যবহার করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থায় সাধারণতঃ হিলিয়ামের সঙ্গে সিজিয়ামকে অথবা আর্গনের সঙ্গে পটাসিয়ামকে বীজ হিসাবে মেশানো হয়।

এম এইচ ডি জেনারেটরের উপযোগিতা

এটা সহজেই হিসাব করে দেখানো যায় যে, এম এইচ ডি নলের আকার যত বড় হবে, ঐ যন্ত্রের কার্যকারিতাও তত বেশি হবে। এজন্যে এম এইচ ডি জেনারেটরের উপযোগিতা অধিক বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন দেশে যে সব এম এইচ ডি যন্ত্রের উপর গবেষণা হচ্ছে, সেগুলির কয়েকটি সেজন্যে বেশ বড় করেই তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এম এইচ ডি জেনারেটরের একটি ভবিষ্যৎ উপযোগিতার কথা বিশেষ করে বলতে হয়। হাইড্রোজেন বোমাকে পোষ মানিয়ে বিজ্ঞানীরা কিভাবে সংযোজন চুল্লী নির্মাণে সচেষ্ট আছেন, সে কথা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলা হয়েছে। চুল্লীতে প্লাজমা মাধ্যমে সংযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে ও সংযোজনের শক্তি অন্ততঃ আংশিকভাবে প্লাজমার তাপ রূপে প্রকাশ পাবে। এম এইচ ডি জেনারেটরের সাহায্যে সেই প্লাজমার তাপশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। বস্তুতঃ এম এইচ ডি জেনারেটরের এই ধরনের ব্যবহারের জন্যেই বিজ্ঞানীরা প্রথমে এর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

উপসংহার

উনিশ শ' ষাটের দশকের গোড়ার কয়েক বছর এম এইচ ডি জেনারেটর সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। কয়েকটি অসুবিধার জন্যে সেই উৎসাহে

ভাঁটা আসে। সত্তরের দশকের প্রায় গোড়া থেকেই আবার নতুন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। বিশেষতঃ রাশিয়ায় এই সময়ে এম এইচ ডি জেনারেটর সম্পর্কে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং বেশ কয়েক মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ইউ-২৫ নামক এম এইচ ডি জেনারেটরকে নিয়মিত ভাবে চালানোও হচ্ছে।

শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এম এইচ ডি জেনারেটরের সম্ভাব্য ভূমিকা এবং আমাদের দেশে এই যন্ত্র তৈরীর সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্যে বছর পাঁচেক আগে আমাদের দেশের যোজনা কমিশন একটি গোষ্ঠীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সেই গোষ্ঠীর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এম এইচ ডি জেনারেটর সম্পর্কিত একটি গবেষণা প্রকল্প যোজনা কমিশন অনুমোদন করেছেন। এই জেনারেটারে ৫ মেগাওয়াট তাপীয় ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হবে কয়লা ও কোল গ্যাস। বোম্বাইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এই জেনারেটর তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে।

টেলিভিসন

উত্তর ইংল্যাণ্ডের এক বড় সহর ম্যান্‌চেস্টার। তার দক্ষিণ প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাস। ভিতরের লাউঞ্জ। এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটি সোফা। এক কোণে টেবিলের উপর বড় একটি টেলিভিসন সেট।

লণ্ডনে টেম্‌সের ধারে সেই যে প্রকাণ্ড ঘড়িটা, বিগ্‌বেন যার নাম, ঘং ঘং করে সে রাত বারোটা ঘোষণা করলো। টেলিভিসনের পর্দায় সেটা ফুটে ওঠে এবং তখনকার মত টেলিভিসনের কার্যসূচীর সমাপ্তি। ব্রায়ান ওয়াকার ও বারীন রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই স্নাতকোত্তর ছাত্র, এতক্ষণ টেলিভিসন ওরফে টেলি (টেলিভিসনের ওটা আদরের ডাক নাম) উপভোগ করছিল। ব্রায়ান উঠে গিয়ে সুইচটি বন্ধ করে দেয়। ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে বলে:

আচ্ছা বারীন, তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, টেলির কার্যকারিতার পেছনের কৌশলটা কি, একটু বুঝিয়ে বলো দেখি।

বারীন বোঝে, শনিবার রাতে এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া ব্রায়ানের স্বভাববিরুদ্ধ, বেশ আরো কিছুক্ষণ সময় সে এখন কাটাতে চায়। বারীন তাই কিঞ্চিৎ বিশদভাবেই ব্যাখ্যা শুরু করে:

রেডিও ও সিনেমার কৌশল যদি তোমার জানা থাকে, টেলির কার্যকারিতা বুঝতে তোমার অসুবিধা হবে না। রেডিওর ক্ষেত্রে কি হয় জানো তো? প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে কোন শব্দের সৃষ্টি হলে বায়ুর চাপের যে তারতম্য ঘটে, সেই অনুযায়ী মাইক্রোফোনের ভিতরের বৈদ্যুতিক সার্কিটের অংশবিশেষ নড়তে থাকে। ফলে ঐ অংশের বৈদ্যুতিক গুণও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয় এবং

শব্দ-তরঙ্গের প্রতিকৃতিস্বরূপ সার্কিটে একটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গটিকে পরিবর্ধিত করে একটি বাহক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাহক তরঙ্গটি শব্দ-তরঙ্গের তুলনায় অনেক দ্রুত স্পন্দনশীল। যা হোক, সমগ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গটি অ্যাণ্টেনার সাহায্যে বেতার তরঙ্গ রূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাহক যন্ত্রের অ্যাণ্টেনায় ঐ বেতার তরঙ্গ গৃহীত হয় এবং তখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে। সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ থেকে বাহক তরঙ্গটিকে এরপর বাদ দেওয়া হয় ও মূল বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পরিবর্ধিত অবস্থায় গ্রাহক যন্ত্রের লাউড-স্পীকারে পাঠানো হয়ে থাকে। লাউড-স্পীকারে একটি চুম্বকের নিকটস্থ তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ঐ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে কুণ্ডলীটি আন্দোলিত হতে থাকে ও কুণ্ডলী-সংলগ্ন একটি বিশেষ কাগজের চোঙা নড়তে থাকে। লাউড-স্পীকারের সম্মুখস্থ বায়ুতে এর ফলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ শব্দ প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সম্মুখস্থ শব্দের অনুরূপ। এভাবে রেডিওতে দূর-দূরান্তের শব্দ শুনতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। টেলিভিসনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কৌশলে শুধু শব্দই নয়, ছবিও পাঠানো হয়ে থাকে। তবে ছবির বেলায় অবশ্য শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তে আলোক-তরঙ্গের প্রয়োগ করা হয়।

যে-কোন দৃশ্যকে আমরা দেখতে পাই, তা থেকে বিক্ষিপ্ত আলোক-তরঙ্গ আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় বলে। কোন দৃশ্যের ছবি টেলিভিসনে পাঠাতে হলে টেলিভিসনের প্রেরক যন্ত্রের ক্যামেরা দৃশ্যটির সম্মুখে রাখা হয়। দৃশ্যটি থেকে আগত আলোক-তরঙ্গ ক্যামেরার ভিতর একটি লেন্সের সাহায্যে বিশেষ বস্তুর এক পর্দার উপর পড়ে সেখানে একটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি করে। পর্দার ঐ বস্তুর বৈশিষ্ট্য এই যে, তার যে অংশে যে পরিমাণ আলো পড়ে, সেই অংশ থেকে সেই অনুপাতে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং যেহেতু ইলেকট্রন কণা ঋণাত্মক আধানযুক্ত, সেহেতু পর্দার ঐ অংশ ইলেকট্রন হারাবার ফলে একই

অনুপাতে ধনাত্মক আধানযুক্ত হয়ে যায়। এভাবে ক্যামেরার সম্মুখস্থ দৃশ্যটির একটি বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতি পর্দার উপর গড়ে ওঠে। পর্দাটির গঠন-বৈশিষ্ট্যের ফলে ঐ প্রতিকৃতি অনেকগুলি অংশ বা উপাদানে বিভক্ত হয়। ক্যামেরার অন্য দিক থেকে একটি ইলেকট্রনগুচ্ছকে পর্দার উপর ফেলা হয় এবং যখন যে উপাদানের উপর ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পড়ে, তখন সেই উপাদানের বৈদ্যুতিক আধান অনুযায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। একের পর এক পর্দার সব উপাদানগুলির উপর ইলেকট্রন-গুচ্ছকে ফেললে সমগ্র প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশের বৈদ্যুতিক আধান অনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয় আইকোনোস্কোপ ক্যামেরায়। টেলিভিসনে যত রকম ক্যামেরা এখন ব্যবহৃত হয়, ঐতিহাসিক ভাবে এটি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। সবচেয়ে বেশি যে ক্যামেরা এখন ব্যবহৃত হয়, তার নাম ইমেজ অর্থিকোন। দৃশ্য থেকে আগত আলো অনুযায়ী এই ক্যামেরার বিশেষ পর্দা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হলে আর একটি টার্গেট প্লেটের উপর তাদের সংহত করা হয় এবং টার্গেট প্লেটে দৃশ্যের যে বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতি গড়ে ওঠে, ইলেকট্রনগুচ্ছের সাহায্যে সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

যা হোক, অতঃপর রেডিওর প্রক্রিয়ার মতই ক্যামেরা থেকে নির্গত বেশি কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে (Video Signal) পরিবর্ধিত করে একটি বাহক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর চাপানো হয়। আবার কথাবার্তা, সঙ্গীত ইত্যাদির শব্দ-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করে এবং সেই অপেক্ষাকৃত কম কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে (Audio Signal) পরিবর্ধিত করে আর একটি বাহক তরঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর অ্যাণ্টেনার সাহায্যে সমগ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বেতার তরঙ্গ রূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাহক যন্ত্রের অ্যাণ্টেনায় বেতার তরঙ্গটি গৃহীত হলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে। ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে কিছুটা পরিবর্ধিত করার পর দুটি বাহক তরঙ্গকে পৃথক করে ফেলা হয়। অতঃপর সে

ছুটি থেকে যথাক্রমে বেশি ও কম কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে উদ্ধার করা হয়। বেশি কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে পরিবর্ধিত অবস্থায় পিক্‌চার টিউবে পাঠানো হয়। কম কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে যথোপযুক্ত আকারে লাউড-স্পীকার পাঠালে সেখানে ঈপ্সিত শব্দের সৃষ্টি হয়।

পিক্‌চার টিউবের একধারে একটি পর্দা আছে, যার উপর টেলি-ভিসনের ছবি ফুটে ওঠে। পিক্‌চার টিউবের অন্য ধার থেকে একটি ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পর্দাটির উপর পড়ে। পর্দাটির ভিতরের দিকে লাগানো থাকে ফস্‌ফর নামে একটি প্রতিপ্রভ পদার্থ। ঐ পদার্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, তার উপর ইলেকট্রন এসে পড়লে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও গতির অনুপাতে তা থেকে আলো নিঃসৃত হয়। পিক্‌চার টিউবে যে বেশি কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরিত হয়, সেটি ইলেকট্রনগুচ্ছের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অনুযায়ী আলো পিক্‌চার টিউবের পর্দা থেকে নির্গত হয়। প্রেরক যন্ত্রের ক্যামেরায় দৃশ্যের বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতির উপাদানগুলিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরের জন্যে যে ভাবে নির্বাচন করা হয়, সেই একই ক্রম অনুসারে পিক্‌চার টিউবের ইলেকট্রনগুচ্ছকে পর্দার বিভিন্ন অংশে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। ফলে পিক্‌চার টিউবের পর্দায় দূরস্থিত ক্যামেরার সম্মুখের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

অবশ্য দৃশ্যের ছবিটিকে নিখুঁতভাবে দেখবার জন্যে ছুটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ছবিকে যে উপাদানগুলিতে ভাগ করা হয়, সেগুলি যত ক্ষুদ্রায়তন হবে, ছবিটি ততই নিখুঁতভাবে দেখা যাবে। কেন না, একটি উপাদানের মধ্যে যদি আলো-ছায়ার তারতম্য থাকে, ছবিতে সেটি ধরা দেবে না; কাজেই উপাদান এত ক্ষুদ্র হওয়া উচিত, যাতে তার মধ্যে আলো-ছায়ার তারতম্য না থাকে, বা থাকলেও যৎসামান্য। একই কারণে, জানো বোধ হয়, ফটোগ্রাফীর প্লেট বা ফিল্মের উপাদানও ক্ষুদ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। টেলিভিসনের এক একটি ছবির উপাদানের সংখ্যা সাধারণতঃ লক্ষাধিক হয়ে থাকে।

ব্রায়ান বারীনকে বাধা দিয়ে বললো: এই ব্যাপারটা ঠিক বোঝা

গেল না। উপাদানগুলিকে অত ছোট হতে হবে কেন ?

বারীন বাজে কাগজের ঝুড়ি থেকে একটা কাগজ তুলে খানিকটা পরিষ্কার অংশ ছিঁড়ে নেয় এবং পকেট থেকে কলম বার করে তার উপর ছবি আঁকতে আঁকতে বলে ঃ

মনে করো, ১ (ক) নং চিত্রে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এই রকম কয়েকটি উপাদান। ১ (খ) নং চিত্রে উপাদানগুলি অনুযায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহ দেখতে পাচ্ছ। ১, ৩ ও ৫ সাদা, সবচেয়ে বেশি আলোক-তরঙ্গ আসছে ঐ উপাদানগুলি থেকে, সেজন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহও সবচেয়ে বেশি। ২নং উপাদান হল কালো, প্রবাহও তাই সবচেয়ে অল্প। আর ৪নং উপাদানের অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো হওয়ায় প্রবাহের পরিমাণ মাঝামাঝি। এখন, ১ (খ) নং চিত্রে দেখানো বিদ্যুৎপ্রবাহকে যদি ফের আলোক-তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়, ১, ২, ৩ ও ৫নং উপাদানকে যথাযথ ভাবেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ ১, ৩ ও ৫ হবে সাদা এবং ২ হবে কালো। ৪নং উপাদানের প্রবাহ কিন্তু মাঝামাঝি হওয়ায় সেটি ধূসর হয়ে দেখা দেবে। ছবিটিকে আরও নিখুঁত ভাবে পেতে হলে উপাদানগুলির আকার আরও ছোট করা দরকার। ধরা যাক, উপাদানের আকার আগেকার তুলনায় অর্ধেক করা হল। ১ (গ) নং চিত্রে উপাদানগুলি ও ১ (ঘ) নং চিত্রে সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহ দেখতে পাচ্ছ। এখন, ঐ প্রবাহকে আলোতে রূপান্তরিত করলে ছবিটি নিখুঁত ভাবে দেখা দেবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, উপাদানগুলি যত ছোট হবে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যকে যত বেশি সংখ্যক উপাদানে ভাগ করা যাবে, তার ছবি তত বেশি নিখুঁত হবে।

ব্রায়ান ঃ ছবি নিখুঁত হওয়ার জন্যে তুমি যে দুটি বিষয়ের কথা বলছিলে, তাদের প্রথমটি বোঝা গেল। দ্বিতীয় বিষয়টি কি ?

বারীন ঃ ছবিকে নিখুঁত ভাবে পেতে হলে উপাদানগুলিকে অত্যন্ত দ্রুত একের পর এক উপস্থাপিত করতে হয়। কোন একটি উপাদানকে আমাদের চোখের সামনে রেখে যদি সেটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়, আরো
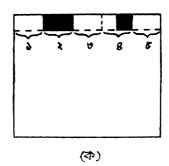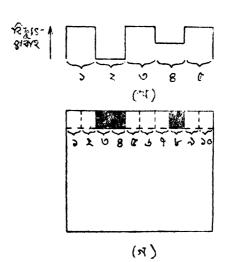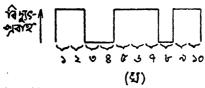
১নং চিত্র—টেলিভিশনের ছবির উপাদান অনুযায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহ

সামান্য কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মনে হবে, সেটি বুঝি উপস্থিত রয়েছে। একে বলা হয় দৃষ্টিনির্বন্ধ (Persistence of vision)। আমাদের দৃষ্টিশক্তির এই বৈশিষ্ট্যের ফলে একটি ছবির উপাদান-গুলিকে যদি দ্রুত একের পর এক উপস্থাপিত করা হয়, তবে আমাদের মনে হবে, আমরা বুঝি সম্পূর্ণ ছবিটিকে একসঙ্গে দেখছি।

টেলিভিসনের ছবির উপাদানগুলিকে যে ভাবে নির্বাচন করা হয়, তার নাম স্ক্যানিং। কোন একটি পৃষ্ঠা পড়বার সময় পাঠকের চোখ যে ভাবে শব্দ চয়ন করে, সেই একই পদ্ধতি। ছবির উপরের বাঁ দিক থেকে শুরু করা ও এক লাইন বরাবর ডান দিকে এগিয়ে যাওয়া। লাইনটি শেষ হলে দ্রুত দ্বিতীয় লাইনের বাঁ দিক থেকে ফের শুরু করা ও লাইনটি ধরে ডান দিকে এগুনো। এভাবে লাইনের পর লাইন অতিক্রম করে একেবারে তলা পর্যন্ত নেমে যাওয়া।

টেলিভিসনে যে ভাবে এই স্ক্যানিং করা হয়, তাতে অন্তর্বুনুনির ব্যবস্থা থাকে—একে বলা হয় ইণ্টারলেস্‌ড্‌ স্ক্যানিং।
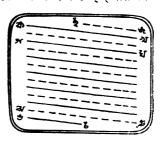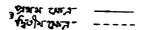
২নং চিত্র—টেলিভিসনে স্ক্যানিং প্রক্রিয়া

ব্রায়ানের চোখে প্রশ্ন ফুটতে দেখে বারীন আবার একটা কাগজ নিয়ে তাতে ছবি এঁকে বলে:

কিভাবে স্ক্যানিং করা হয়, ২নং চিত্রে তাই তোমায় দেখাচ্ছি।

ইলেকট্রনগুচ্ছ উপরের ক বিন্দু থেকে শুরু করে অবিচ্ছিন্ন রেখা কখ বরাবর খ বিন্দু পর্যন্ত যায়। তারপর আবার গ বিন্দু থেকে ঘ বিন্দু। এইভাবে ক্রমশঃ নিচে নামতে নামতে ইলেকট্রনগুচ্ছ ঙচ রেখা বরাবর চ বিন্দুতে পৌঁছলে তার নিম্নগতি বন্ধ হয়। অতঃপর ইলেকট্রনগুচ্ছ একেবারে উপরের ছ বিন্দু থেকে ফুটকি-ফুটকি রেখা ছজ বরাবর জ বিন্দু পর্যন্ত যায়। তারপর ফুটকি-ফুটকি রেখাগুলি দিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যেতে যেতে ইলেকট্রনগুচ্ছ ক্রমশঃ নিচে নামে। ঞ বিন্দুতে পৌঁছলে তার নিম্নগতি বন্ধ হয়। এইভাবে ছবিটির স্ক্যানিং একবার সম্পূর্ণ হল। অতঃপর ইলেকট্রনগুচ্ছ ক বিন্দু থেকে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করে।

কখ, গঘ ইত্যাদি যে অবিচ্ছিন্ন রেখাগুলি তোমায় দেখালাম, তাদের সমষ্টিকে বলা হয় প্রথম ক্ষেত্র। আর ফুটকি-ফুটকি রেখাগুলির সমষ্টিকে বলে দ্বিতীয় ক্ষেত্র।

বৃটেনে টেলিভিসনের এক একটি ছবিতে মোট রেখার সংখ্যা ৪০৫, অ্যামেরিকায় ৫২৫, ফ্রান্সে ৪৪১ ও ৮১৯, রাশিয়া ও অন্যান্য বেশির ভাগ দেশে ৬২৫, আমাদের ভারতবর্ষেও ঐ ৬২৫। রেখার সংখ্যাকে আন্তর্জাতিকভাবে ৬২৫ হিসাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

স্ক্যানিং-এর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল না, যদি ছবির প্রতিটি উপাদানের জন্যে পৃথক বৈদ্যুতিক সার্কিটের ব্যবস্থা থাকতো। উপাদান-গুলির সংকেতকে তখন এক সঙ্গে পাঠানো সম্ভব হতো এবং পিক্‌চার টিউবের পর্দায় সেগুলিকে একসঙ্গে উপস্থাপিত করলে সম্পূর্ণ ছবিটিকে দেখা যেত। কিন্তু এক একটি ছবির লক্ষাধিক উপাদানের জন্যে লক্ষাধিক সার্কিটের প্রয়োজন। প্রতিটি প্রেরক-যন্ত্রে, বিশেষ করে প্রতিটি গ্রাহক যন্ত্রে লক্ষাধিক সার্কিটের ব্যবস্থা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্ক্যানিং-এর ব্যবস্থায় একটি সার্কিটের সাহায্যেই সমস্ত উপাদান-গুলির সংকেতকে পাঠানো হয়ে থাকে।

স্ক্যানিং সম্পর্কে আরো দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি।

স্ক্যানিং-এর সময় প্রেরক যন্ত্রের ক্যামেরায় ঠিক যতক্ষণ অন্তর অন্তর রেখাগুলি উপস্থাপিত হয়, গ্রাহক-যন্ত্রের পিক্‌চার টিউবে ঠিক ততক্ষণ অন্তরই আবার রেখাগুলিকে উপস্থিত করা প্রয়োজন। এর জন্যে প্রতি রেখার শুরুতে একটি সমলয় সংকেত (Synchronising pulse) টেলিভিসনের বেতার তরঙ্গের সঙ্গে প্রেরিত হয়। গ্রাহকযন্ত্রে ঐ সংকেতটিকে বেছে নিয়ে তার সাহায্যে যথাসময়ে রেখাগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে।

আবার প্রতিটি রেখার শেষ থেকে পরের রেখার আরম্ভ পর্যন্ত ইলেকট্রনগুচ্ছকে দ্রুত পিছন দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে সময় লাগে, যান্ত্রিক কৌশলে সেই সামান্য সময় ক্যামেরা ও পিক্‌চার টিউবের পর্দায় ইলেকট্রনগুচ্ছের আঘাত বন্ধ রাখা হয়। এর জন্যে একটি বিলোপকারী সংকেত (Blanking pulse) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সমলয় সংকেতের মত একেও টেলিভিসনের বেতার তরঙ্গের সঙ্গে পাঠানো হয়।

আবার, প্রত্যেক রেখার শুরু ও শেষে যেমন, ছবির প্রতি ক্ষেত্রের শুরু ও শেষেও তেমন যথাক্রমে সমলয় সংকেত ও বিলোপকারী সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা আছে।

ব্রায়ান এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে বারীনের কথা শুনছিল। এবার বললো, ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, তবে কিঞ্চিৎ ঘোরালো। মগজের গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া আবশ্যক—বলে পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ভরতে লাগলো। তারপর বললে—আচ্ছা বন্ধু, টেলিভিসনে একটি ছবিকে কিভাবে পাঠায়, তা তো খানিক বুঝলাম। কিন্তু গতিশীল দৃশ্যকে কেমন করে দেখানো হয়?

যেমন করে সিনেমায় দেখানো হয়ে থাকে, বারীন বলে। একটি ঘটনা যখন ঘটছে, পরপর তার অনেকগুলি ছবি তুলে সেই ছবিগুলিকে যদি ক্রম অনুযায়ী দ্রুত চোখের সামনে উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে মনে হবে ঘটনাটিই বুঝি আমরা দেখছি। এর মূলেও অবশ্য আমাদের দৃষ্টিনির্বন্ধ, দৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্যের কথা একটু আগে তোমাকে বলেছি।

কত দ্রুত ছবিগুলি দেখানো হয়—শোনো। সিনেমায় প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টি, টেলিতে আরো বেশি, সেকেণ্ডে ২৫ বা ৩০টি। আর একটি বক্তব্য আছে। ছবিগুলির উপস্থাপনের দ্রুততা বাড়াবার জন্যে সিনেমায় প্রতিটি ছবিকে পরপর দু'বার দেখানো হয়, আর টেলিতে প্রতিটি ছবিকে স্ক্যানিং-এর সময় দুটি ক্ষেত্রে ভাগ করে পরপর সে দুটি দেখানো হয়। যে ইণ্টারলেস্‌ড্ স্ক্যানিং-এর কথা তোমায় আগে বলেছি, তার প্রয়োজনীয়তা এখন তাহলে বুঝতে পারলে।

বব অ্যাড্‌লার ঘরে ঢোকে। বব মার্কিনদেশীয় ছাত্র। ম্যান্‌চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি পড়ছে। বলে:

টেলি বন্ধ কেন?—বারোটা বেজে গেছে বুঝি?

ব্রায়ান ঘাড় নেড়ে জানায়, ববের আন্দাজই ঠিক। তারপর বলে:

টেলি বন্ধ বটে, তবে বারীন টেলিভিসন সম্বন্ধে আমাকে বেশ খানিকটা জ্ঞান দিয়ে দিয়েছে।

টেলির কত বয়স হবে বলো তো বারীন, বব জিজ্ঞেস করে। মানে টেলি তো অত্যন্ত জনপ্রিয়, আমার দেশ অ্যামেরিকায় এত জনপ্রিয় বোধকরি আর কেউ নেই! আমিও—বুঝলে, আমিও চাই ঠিক ঐ রকম জনপ্রিয় হতে। তাই জানতে চাই, টেলির কতদিন লেগেছে এই রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করতে?

বারীন: টেলিভিসনের সূত্রপাত বলতে গেলে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, পাওল নিপকাও নামে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক যখন স্ক্যানিং-এর একটি যন্ত্র তৈরি করেন। টেলিভিসনের অন্যান্য কৌশল সম্পর্কেও পাওলের মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা ছিল, কিন্তু বাস্তব অবস্থা তখন টেলি তৈরির অনুকূল ছিল না, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তখনও উদ্ভব হয়নি। প্রকৃত টেলিভিসনের জন্মদাতা বলা চলে জন লগি বেয়ার্ডকে। এই স্কটল্যাণ্ডীয় ভদ্রলোকটি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্যহানির দরুণ তাঁকে ব্যবসা ছেড়ে দিতে হয়। তিনি কিন্তু অবদমিত না হয়ে টেলিভিসন প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন।

১৯২৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী সরকারীভাবে টেলি প্রথম প্রদর্শিত হল; রয়্যাল ইনস্টিটুট্যের সভ্যদের বেয়ার্ড তাঁর যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখালেন। লণ্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটনের বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় যদি যাও, বেয়ার্ড-নির্মিত প্রথম টেলিভিসন যন্ত্রটি সেখানে দেখতে পাবে। দেখে অবাক হবে যে, নেহাৎ সাধারণ যন্ত্রপাতি, যেমন ধরো পুরনো সাইকেলের কলকব্জা— এই সব দিয়ে এই যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমানে যে টেলি দেখছো, এটা কিন্তু ঠিকভাবে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত হয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে—বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন, সংক্ষেপে যাকে বি বি সি বলা হয়, লণ্ডনের আলেকজাণ্ড্রা প্যালেস থেকে যখন টেলিভিসনের প্রচার শুরু করলো। টেলিভিসনের ব্যাপারে ঐ সময় বৃটেন ও অ্যামেরিকার মধ্যে বেশ কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। বৃটেনেরই অবশ্য জয় হয়। অ্যামেরিকায় জনসাধারণের জন্যে টেলি-ভিসনের প্রচার শুরু হয় ১৯৪১ সালে অর্থাৎ বৃটেনের ৫ বছর পরে।

ব্রায়ান বলে ওঠে : থ্রী চীয়ার্স ফর বৃটানিয়া, হিপ্ হিপ্ হুররে!

বারীন : তোমার অত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কারণ নেই, ব্রায়ান। পরবর্তী সময়ে অ্যামেরিকা ও রাশিয়া বৃটেনের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছলো। অ্যামেরিকা এবং রাশিয়ায় রঙীন টেলিভিসন আরম্ভ হয় বৃটেনের অনেক আগে।

বব খুশি হয়ে নড়েচড়ে বসে। বলে—আচ্ছা, টেলিতে রঙীন ছবি দেখাবার কৌশলটা কি?

বারীন : মূল কথাটি কি, বলছি। লাল, নীল ও সবুজ, এই তিন বর্ণের যথাযথ সংমিশ্রণের ফলে যে-কোন বর্ণের সৃষ্টি করা যেতে পারে। অপর পক্ষে যে-কোন বর্ণকে বিশ্লেষণ করে ঐ তিনটি বর্ণে রূপান্তরিত করা যায়। ঐ তিনটিকে তাই প্রাথমিক বর্ণ বলা হয়ে থাকে। টেলিভিসনের ক্যামেরার সামনে যে দৃশ্য থাকে, তা থেকে বিক্ষিপ্ত আলোককে ফিল্টারের সাহায্যে তিনটি প্রাথমিক বর্ণের আলোক-তরঙ্গে বিভক্ত করা হয়। তারপর ঐ তিনটি আলোক-তরঙ্গ যথারীতি

বেতার তরঙ্গে রূপান্তরিত অবস্থায় প্রেরিত হয়। গ্রাহক যন্ত্রে এর ফলে তিনটি বিভিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ তিনটি তরঙ্গ ও গ্রাহক যন্ত্রের পিক্‌চার টিউবের পর্দায় তিন ধরনের ফস্‌ফরের সাহায্যে প্রেরক যন্ত্রের ক্যামেরার সম্মুখস্থ দৃশ্যটির রঙীন প্রতিকৃতি সঠিক দেখতে পাওয়া যায়। ঐ তিন ধরনের ফস্‌ফরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ওদের এক একটি থেকে এক এক বর্ণের আলোই কেবল বিক্ষিপ্ত হয়, একটি থেকে লাল, আর একটি থেকে নীল ও অপরটি থেকে সবুজ।

বব: আচ্ছা—বারীন, রেডিওয় তো আমাদের দেশের কথাবার্তা এখানে বসে শুনতে পাই। টেলিভিসনের ছবি দেখতে পাই না কেন?

বারীন: দূরপাল্লার বেতার তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের অ্যান্টেনা থেকে গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনায় কিভাবে সাধারণতঃ এসে উপস্থিত হয়, জানো তো? —ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ হতে ৫০০ কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত যে আয়নমণ্ডল আছে, তা থেকে প্রতিফলিত হয়ে। টেলিভিসনের জন্যে যে বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রেডিওর জন্যে ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেকখানি ছোট। ঐ বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয় না, আয়নমণ্ডল পেরিয়ে চলে যায়। আয়নমণ্ডল যেন একটি ছোট্ট দরজা—যার মধ্য দিয়ে বড় তরঙ্গ যেতে পারে না কিন্তু ছোট তরঙ্গ অনায়াসেই চলে যায়। এজন্যেই তোমার দেশ থেকে টেলিভিসনের ছবি এদেশে সাধারণতঃ আসে না। তবে কোন কিছু থেকে টেলিভিসনের বেতার তরঙ্গকে যদি কার্যতঃ প্রতিফলিত করা যায়, তবে রেডিওর মত টেলিও সহজে দূরপাল্লায় পাড়ি দেবে। সাম্প্রতিক কালে নতুন এক ব্যবস্থায় এটি সম্ভবও হয়েছে।

ব্রায়ান: নতুন ব্যবস্থাটি কী—আমি জানি, বারীন। যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহের কথা তুমি বলছো তো?

ঠিকই বলেছ ব্রায়ান, বারীন বলে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সর্বপ্রথম অ্যামেরিকা থেকে পাঠানো টেলিভিসনের ছবি আটলান্টিক

মহাসাগর পেরিয়ে ফ্রান্স ও বৃটেনের গ্রাহক যন্ত্রের পর্দায় দেখা দিয়েছিল। ঐ টেলিভিসনের বেতার তরঙ্গ অ্যামেরিকা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত টেল্‌স্টার নামক উপগ্রহ থেকে কার্যতঃ প্রতিফলিত হয়ে আসে। পরবর্তী কালে এমন কয়েকটি উপগ্রহের সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের সাহায্যে টেলিভিসন রেডিওর মতই দূর-দূরান্তে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এই যোগাযোগকারী ব্যবস্থায় বাহক তরঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে মাইক্রো-তরঙ্গ (Microwave) নামক অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ।

একটু বিশদ ভাবে বলতে গেলে অবশ্য অধিকাংশ যোগাযোগকারী উপগ্রহ বেতার তরঙ্গকে কেবল প্রতিফলিতই করে না, তার পরিবর্ধনও করে। বস্তুতঃ ঐগুলি রীলে (Relay) হিসাবে কাজ করে। রীলের কাজ হল প্রেরক যন্ত্রের দিক থেকে আগত বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে তার শক্তি বৃদ্ধি করা ও তারপর তাকে গ্রাহক-যন্ত্রের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া। প্রসঙ্গক্রমে আমার বোধহয় বলে রাখা উচিত যে, টেলিভিসনের বেতার তরঙ্গ রীলের সাহায্যে স্থলপথে এখন দূরের পথে নিয়মিত পাঠানো হয়ে থাকে। তবে সে ক্ষেত্রে টেল্‌স্টারের মত একটি নয়, অনেকগুলি রীলেকে পরপর ব্যবহার করতে হয়। ইওরোপের অনেকখানি জুড়ে এইভাবে টেলিভিসনের যে সংযোগ-পথ রয়েছে, তার নাম ইওরোভিসন। ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংকির মাধ্যমে মস্কো এই ইওরোভিসনের সঙ্গে সংযুক্ত। আবার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অ্যামেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্থলপথে টেলিভিসনের সংযোগ ব্যবস্থা আছে।

বব: টেলির জয়যাত্রা অনেক দূর এগিয়েছে বুঝলাম। কিন্তু বারীন, এখনো তো এমন দেশ রয়েছে, যেখানে টেলিভিসন অনুপস্থিত বললেই চলে। তোমার দেশেই ধরো না, অবস্থাটা কী?

আমাদের দেশ যে একেবারে পিছিয়ে আছে তাও নয়, বারীন জানায়। দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ ইত্যাদি সহরে তো নিয়মিত ভাবে টেলিভিসন চালু হয়ে গেছে। বর্তমানে অবশ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে প্রচারিত হয়। তবে টেলিভিসনের প্রসার ক্রমেই বাড়ছে।

অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশেও টেলিভিসনের প্রবর্তন হয়েছে।

আর টেলির জয়যাত্রার কথা যখন তুললে, তখন বলতে হয় যে, টেলির জয়যাত্রাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কত রকম কাজে যে তাকে নিয়োজিত করা হচ্ছে, সেটা জানা দরকার। এই প্রসঙ্গে বদ্ধ সার্কিট (Closed circuit) টেলিভিসনের উল্লেখ করতে হয়। নির্দিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর জন্যে প্রচারিত টেলিভিসনের এই ব্যবস্থায় সাধারণতঃ বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় না, টেলিভিসনের ক্যামেরায় উৎপন্ন সংকেতকে তারের মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহক যন্ত্রে পাঠিয়ে দিয়ে ঈপ্সিত ছবি ও শব্দের সৃষ্টি করা হয়। কল-কারখানায় তো হামেশাই এই ব্যবস্থার প্রয়োগ হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, দূর থেকে কোন বস্তুকে যখন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, টেলিভিসনের সাহায্যে তখন ঐ দূরের বস্তুটির ছবি চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার মনে করো, হাসপাতালের অস্ত্রচিকিৎসার কক্ষে কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক একটি শক্ত অস্ত্রচিকিৎসা করছেন। টেলিভিসনের সাহায্যে ঐ অস্ত্রচিকিৎসার খুঁটিনাটি বহু ছাত্রকে একসঙ্গে দেখানো হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের নানান পরীক্ষাও একই ভাবে বহু শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে দেখানো যায়। স্কুল-কলেজের শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে টেলিভিসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

টেলিভিসনের আর এক ধরনের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। ওয়াইট দ্বীপের কাছে সমুদ্রের ২৮০ ফুট নিচে অকর্মণ্য একটি ডুবোজাহাজকে খুঁজে বের করা ও তা থেকে লোকজনকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে বৃটিশ নৌবাহিনী জলের তলায় টেলিভিসনকে কাজে লাগিয়েছে। ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন কুস্তো টেলিভিসনের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত একটি প্রাচীন গ্রীসদেশীয় বাণিজ্যপোতকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

টেলিভিসনের সবচেয়ে চমকপ্রদ অবদান ঘটেছে মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে। চন্দ্রের এক পৃষ্ঠ সব সময় পৃথিবীর দিকে ঘোরানো, অন্য পৃষ্ঠ

পৃথিবী থেকে কোন সময়েই দেখা যায় না। রাশিয়ার প্রেরিত লুনিক-৩ নামক আন্তগ্র্হ স্টেশন থেকে সর্বপ্রথম ঐ অদৃশ্য পৃষ্ঠটির ছবি তুলে টেলিভিসনের সাহায্যে তা পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, যা কেবল কল্পনার বিষয় ছিল, তা প্রত্যক্ষীভূত হল। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই চন্দ্রপৃষ্ঠে মার্কিন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং-এর প্রথম পদক্ষেপের যে ঐতিহাসিক ঘটনা, টেলিভিসনের মাধ্যমে তা পৃথিবীতে সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছলো। সারা পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক টেলিভিসনের পর্দায় এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল। চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাকাশচারীদের কার্যকলাপও একই ভাবে পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া গেল। যে সব মহাকাশযান শুক্র বা মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করেছে বা তাদের কাছ দিয়ে চলে গেছে, সেই সব মহাকাশযান থেকে পাঠানো টেলিভিসনের ছবির পাঠোদ্ধার করে ঐ সব গ্রহ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা গেছে।

মহাকাশ বিজ্ঞানের অন্যতম অবদান যে আবহাওয়া উপগ্রহ (Weather satellite) ব্যবস্থা, তাইতে টেলিভিসন ব্যবহার করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অপেক্ষাকৃত নিখুঁত করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত অনেকগুলি আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে ক্রমাগত পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মেঘাবরণের ছবি তুলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেলিভিসনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত গ্রাহক স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সব ছবি গ্রহণ করবার জন্যে বর্তমানে প্রায় ৪৫টি দেশে কমবেশি ৮০০ স্টেশন আছে—আমাদের ভারতবর্ষেও এই রকম ৫টি স্টেশন রয়েছে। উপগ্রহগুলি থেকে পাঠানো ছবি বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া সম্পর্কিত নানান তথ্য জানা যায়।

ব্রায়ান : জয়, টেলিভিসনের জয়! আমি বলি কি—বারীন, তোমাকে তো আমরা অনেকক্ষণ বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিলাম, এবার চলো তোমার ঘরে গিয়ে টেন্সির একটু স্বাস্থ্যপান করা যাক।

তিন বন্ধু এবার উঠে পড়ে।

মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা

কলকাতার বি. বি. ডি. বাগে টেলিফোন ভবনের ছাদের উপর বিরাট ঝুড়ির মত দেখতে তিনটি বস্তু আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জেগেছে— কী কাজে লাগে ঐগুলি ? এর উত্তর হল—ঐগুলি বিশেষ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান। এই ব্যবস্থায় মাইক্রো-তরঙ্গ (Microwave) নামে সূক্ষ্ম বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়।

গত ৩০ বছরে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে যে দেশ-দেশান্তরে টেলিফোনের কথাবার্তা, টেলিভিসনের ছবি ইত্যাদি পাঠানো হচ্ছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

মাইক্রো-তরঙ্গ কি ও কেন

রেডিওর সংকেত বহন করে যে সব বেতার তরঙ্গ, সেগুলির দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক শ' মিটার হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট, তার চেয়েও অনেক ছোট হল মাইক্রো-তরঙ্গ। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ঊর্ধ্বতম সীমা ৩০ সেন্টিমিটার। নিম্নতম সীমা আগে ধরা হত এক সেন্টিমিটার ; এখন সাধারণভাবে এক মিলিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গকেও মাইক্রো-তরঙ্গ বলা হয়।

আমরা জানি, বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কমে, তার কম্পাঙ্ক (Frequency) তত বাড়ে। রেডিওর জন্যে ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গের ঊর্ধ্বতম কম্পাঙ্ক যেখানে কয়েক মেগাহার্ৎজ (Megahertz, সংক্ষেপে

MHz : 10^6 Hz), মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সেখানে এক গিগাহার্ৎজ (Gigahertz, সংক্ষেপে GHz : 10^9 Hz) থেকে কয়েক শ' গিগাহার্ৎজ পর্যন্ত হতে পারে।

বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেশি হলে যোগাযোগের দিক থেকে একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, তা বেশি সংকেত বহন করতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কম্পাঙ্ক ১ মেগাহার্ৎজ হলে সেই তরঙ্গ যেখানে একটি রেডিও স্টেশনের শব্দ-সংকেত বয়ে নিয়ে যেতে পারে, কম্পাঙ্ক ১ গিগাহার্ৎজ হলে ঐ রকম হাজারখানেক সংকেত একসঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া তরঙ্গের পক্ষে সম্ভব হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে মাইক্রো-তরঙ্গের জন্মদাতা বলা চলে। প্রায় ৮০ বছর আগে তিনি কলকাতায় তাঁর গবেষণাগারে মাইক্রো-তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।

মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে

মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যোগাযোগকারী স্থানে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র থাকে। প্রেরক যন্ত্রে মাইক্রো-তরঙ্গ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। শব্দ বা ছবির সংকেতকে প্রেরক যন্ত্রে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপায়িত করে উপযুক্ত পদ্ধতিতে মাইক্রো-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তরঙ্গ-পরিচালক (Waveguide) নামক বিশেষ ধরনের ফাঁপা ধাতব নলের মধ্য দিয়ে ঐ মাইক্রো-তরঙ্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রাথমিক অ্যান্টেনায়। এই অ্যান্টেনা সাধারণতঃ 'হর্ন অ্যান্টেনা' নামক শঙ্কু-আকৃতিবিশিষ্ট একটি ধাতব নল। এই অ্যান্টেনা থাকে একটি প্রকাণ্ড অধিবৃত্তাকার (Parabolic) প্রতিফলকের ফোকাসে। সেই প্রতিফলকটি মূল অ্যান্টেনা হিসাবে কাজ করে। প্রাথমিক অ্যান্টেনা থেকে নির্গত মাইক্রো-তরঙ্গ এতে প্রতিফলিত হয়ে মোটামুটি সমান্তরাল

রশ্মিগুচ্ছরূপে আকাশ-পথে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হয়। গ্রাহক স্টেশনের অধিবৃত্তাকার অ্যাণ্টেনায় সেই মাইক্রো-তরঙ্গ এসে উপস্থিত হলে তা কেন্দ্রীভূত হয় অ্যাণ্টেনাটির ফোকাসে রক্ষিত প্রাথমিক অ্যাণ্টেনায় এবং সেখান থেকে চলে যায় তরঙ্গ-পরিচালকের মাধ্যমে গ্রাহক-যন্ত্রের পরিবর্ধকে। পরে মাইক্রো-তরঙ্গ থেকে শব্দ বা ছবির সংকেতকে বৈত্যুতিক আকারে বের করে নেওয়া হয় এবং তাকে রূপান্তরিত করা হয় মূল শব্দ বা ছবির অনুরূপ সংকেতে। টেলিফোন ভবনের ছাদের উপর প্রকাণ্ড ঝুড়ির মত দেখতে যে বস্তুর কথা গোড়ায় বলা হয়েছে, তা আসলে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিবৃত্তাকার অ্যাণ্টেনা। বহু ক্ষেত্রে একই অ্যাণ্টেনা ব্যবহার করে মাইক্রো-তরঙ্গ প্রেরণ বা গ্রহণ করা হয়।

রেডিওর জন্যে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ দূর দেশে পাঠানো হয় পৃথিবীর আয়নমণ্ডলকে প্রতিফলক হিসাবে কাজে লাগিয়ে। এই আয়নমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ হতে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় অবস্থিত। প্রেরক যন্ত্র থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে দূরের গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে উপস্থিত হয়। মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কিন্তু যথেষ্ট বেশি হওয়ায় তা আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয় না, আয়নমণ্ডল ভেদ করে ঊর্ধ্বাকাশে চলে যায়। সেজন্যে এই তরঙ্গকে দূরে পাঠাতে হলে অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ঐ ব্যবস্থা দু'রকম হতে পারে:—(১) ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত অনেকগুলি রিপিটার স্টেশন বা রীলে ব্যবহার করে; (২) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে।

স্থলপথে যোগাযোগ

প্রেরক যন্ত্রের অ্যাণ্টেনা থেকে কোন নির্দিষ্ট দিকে মাইক্রো-তরঙ্গ নিক্ষেপ করলে তা দৃষ্টিরেখা (Line of sight) বরাবর মোটামুটি সরল রৈখিক পথে প্রবাহিত হয়। ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্যে এই তরঙ্গ

পৃথিবীর কোন স্থান থেকে স্থানান্তরে বেশি দূর যেতে পারে না। প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনাকে পাহাড়ের চূড়ায় বা উঁচু টাওয়ারের উপর স্থাপন করে এই দূরত্ব কিছু বাড়ানো যায়। পৃথিবীর কোন স্থান থেকে অনেক দূরের কোন স্থানে মাইক্রো-তরঙ্গ পাঠাতে হলে ঐ দুটি স্থানের মধ্যে প্রায় ৫০ কিলোমিটার অন্তর অন্তর রিপিটার স্টেশন স্থাপন করা হয়। প্রেরক যন্ত্রের অ্যান্টেনা থেকে মাইক্রো-তরঙ্গ প্রথম রিপিটার স্টেশনের একটি অ্যান্টেনায় পৌঁছলে সেখানে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় পরিবর্ধিত হয় এবং সেই পরিবর্ধিত তরঙ্গ অন্য একটি অ্যান্টেনার মাধ্যমে বিপরীত দিকে দ্বিতীয় রিপিটার স্টেশনের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে পর পর রিপিটার স্টেশনের মধ্য দিয়ে গিয়ে মাইক্রো-তরঙ্গ পরিশেষে গ্রাহক স্টেশনের অ্যান্টেনায় উপস্থিত হয়।

মাইক্রো-তরঙ্গের প্রবাহের পথে নানা কারণে তার কিছুটা শক্তিক্ষয় হয় বলে রিপিটার স্টেশনে পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকে। রিপিটার স্টেশন লোকজন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। কোন যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটলে নিয়ন্ত্রণকারী স্টেশনে তা ধরা পড়ে এবং সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত করা হয়ে থাকে।

ইওরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টেলিভিসনের সংকেত বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে অনেকগুলি রীলে ব্যবহার করে যে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে বলা হয় 'ইওরোভিসন'। অ্যামেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। টেলিভিসনের সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কেবল টেলিভিসনের জন্যেই নয়, রেডিও, টেলিফোন, টেলেক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। একটিমাত্র মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার করে কয়েক হাজার টেলিফোনের কথাবার্তা একসঙ্গে পাঠানো যেতে পারে। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এই ব্যবহারই সমধিক প্রচলিত।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগ

দুটি দূরবর্তী স্থানের মধ্যে মাইক্রো-তরঙ্গ সংযোগের সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেকখানি উচ্চতায় হওয়ায় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে। এজন্যে প্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো মাইক্রো-তরঙ্গ উপগ্রহ মারফৎ দূরের গ্রাহক স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। বিপুল জলরাশি পেরিয়ে আন্তর্মহাদেশীয় মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহারই এখন একমাত্র সমাধান।

যোগাযোগকারী উপগ্রহ দু' ধরনের হতে পারে : নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ কেবল প্রতিফলকের মত কাজ করে—প্রেরক স্টেশন থেকে আগত মাইক্রো-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে গ্রাহক স্টেশনের দিকে পাঠিয়ে দেয়। সক্রিয় উপগ্রহে মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে সেই তরঙ্গকে পরিবর্ধিত আকারে গ্রাহক স্টেশনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। নিষ্ক্রিয় উপগ্রহে জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রেরক যন্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত শক্তির অতি সামান্য অংশই গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে উপস্থিত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে একো (Echo) নামক উপগ্রহের ক্ষেত্রে এই অংশ ছিল $১০^{১৮}$ ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কয়েকটি নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। পরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি হওয়ায় প্রধানতঃ সক্রিয় উপগ্রহকেই যোগাযোগকারী উপগ্রহ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে টেল্‌স্টার নামক সক্রিয় উপগ্রহটির কথা আমরা অনেকেই শুনেছি।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ ভূপৃষ্ঠ থেকে কতখানি উচ্চতায় থাকবে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই উচ্চতা কয়েক শ' কিলোমিটার হয়, তাহলে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্যে বেশ অনেকগুলি উপগ্রহের প্রয়োজন, কারণ যে-কোন উপগ্রহ এক দিগন্ত

থেকে উঠে অন্য দিগন্তে নেমে যেতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না এবং দৃশ্য আকাশ থেকে উপগ্রহটি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই (বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুটা আগেই) অন্য একটি উপগ্রহের সেইখানে উপস্থিত হওয়া দরকার। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগের জন্যে একসময় ৫০টি উপগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যদি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের উচ্চতা প্রায় ৩৫,০০০ কিলোমিটার হয় এবং এই কক্ষপথ ঠিক বিষুবরেখার উপর বরাবর থাকে, তাহলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির পর্যায়কাল ও উপগ্রহটির আবর্তনের পর্যায়কাল সমান হওয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের কোন এক জায়গার মাথার উপর উপগ্রহটি স্থির অবস্থায় আছে বলে মনে হয়। এই ধরনের উপগ্রহকে বলা হয় সমলয় (Synchronous) উপগ্রহ বা ভূ-স্থির (Geostationary) উপগ্রহ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠের প্রায় চার-দশমাংশ স্থান এই উপগ্রহের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে। এই রকম তিনটি উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সব অঞ্চল জুড়ে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হতে পারে। অ্যামেরিকা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত সিন্‌কম (Syncom) উপগ্রহগুলি ছিল এই ধরনের।

১৯৬৪ সালে ১১টি দেশের মধ্যে চুক্তির ফলে যে আন্তর্জাতিক উপগ্রহ যোগাযোগ সংস্থা (সংক্ষেপে INTELSAT : ইন্‌টেল্‌স্যাট) গড়ে ওঠে এবং যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮০-এরও বেশি, সেই সংস্থার পক্ষে উৎক্ষিপ্ত ইন্‌টেল্‌স্যাট উপগ্রহগুলি সবই সমলয় উপগ্রহ। এই উপগ্রহ অনেকগুলি প্রেরক-গ্রাহকজোড়ের মধ্যে একই সময়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে যে মাইক্রো-তরঙ্গ সংকেত বহন করে উপগ্রহে যায়, তার কম্পাঙ্ক ৬ গিগাহার্ৎজ। সেই সংকেতকে যে মাইক্রো-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে উপগ্রহ থেকে গ্রাহক স্টেশনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তার কম্পাঙ্ক ৪ গিগাহার্ৎজ। এই রকম মাইক্রো-তরঙ্গ ১২টি পৃথক টেলিভিসন সংকেত বা কয়েক হাজার টেলিফোনের কথাবার্তা একসঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। আরো উচ্চ কম্পাঙ্কের মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার

করে আরো বেশি সংকেত একসঙ্গে পাঠাবার চেষ্টা হচ্ছে।

যোগাযোগকারী উপগ্রহের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'অর্বিটা' (Orbita) ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে কয়েকটি উপগ্রহ ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদূর উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যবস্থা প্রথমতঃ প্রচলিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় বাহক বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ছিল ৮০০ থেকে ৯০০ মেগাহার্ৎজ অর্থাৎ মাইক্রো-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের চেয়ে কিছু কম। পরে কয়েক গিগাহার্ৎজ কম্পাঙ্কের মাইক্রো-তরঙ্গ বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের দেশেও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছু কিছু কাজ হয়েছে। ৭-৮ বছর আগে পুনা থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তরে মহারাষ্ট্রের আর্ভি নামক গ্রামে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। জায়গাটি চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা থাকায় অবাঞ্ছিত মাইক্রো-তরঙ্গ সংকেত (Microwave noise) এখানে এসে পৌঁছতে পারে না। ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থিত ইন্‌টেল্‌স্যাট-৩ নামক ভূ-স্থির উপগ্রহের মাধ্যমে কেন্দ্রটি বহু বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। কেন্দ্রটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে বিরাট অধিবৃত্তাকার অ্যান্টেনা, যার ব্যাস ২৯·৭ মিটার ও ওজন প্রায় ২০০ টন। উপগ্রহ থেকে অ্যান্টেনায় মাইক্রো-তরঙ্গ সংগৃহীত হলে কয়েকটি রিপিটার স্টেশনের মাধ্যমে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোম্বাইয়ের একটি ১৭-তলা বাড়ির ছাদের উপরে টাওয়ারে সংলগ্ন অধিবৃত্তাকার অ্যান্টেনায় (১নং চিত্র)। তারপর সেই মাইক্রো-তরঙ্গ থেকে মূল শব্দ বা ছবির সংকেত বের করে নিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবার কোন সংকেত বিদেশে পাঠাতে হলে মাইক্রো-তরঙ্গে ভর করে তা আসে বোম্বাই থেকে আর্ভিতে এবং সেখানকার কেন্দ্র থেকে উপগ্রহ মারফৎ চলে যায় তার গন্তব্যস্থলে।

কিছুকাল আছে যে সাইট (SITE : উপগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষামূলক

পরীক্ষা) ব্যবস্থায় এ টি এস-৬ উপগ্রহ ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে টেলিভিসনের সংকেত পাঠানো হয়েছিল, সেই সংকেতকে প্রথমতঃ দিল্লী ও আমেদাবাদ থেকে ৬ গিগাহাৎ´জ কম্পাঙ্কের মাইক্রো-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে পাঠানো হয় উপগ্রহটিতে।
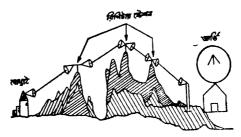
১নং চিত্র—আর্ভি থেকে বোম্বাই পর্যন্ত
মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা

বহু নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হবার ফলে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেই কেবল নয়, মহাকাশ পাড়ি দিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

রেডার : মানুষের যান্ত্রিক দৃষ্টি

আমার এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে একদিন রেডারের কথা উঠেছিল। বন্ধুবর কপাল, বুক ও দুই কাঁধে হাত ঠেকিয়ে ক্রশের চিহ্ন আঁকলেন এবং বললেন, রেডার আমাদের ত্রাণকর্তা, বৃটেনের চারধারে 'চেন হোম' রেডার স্টেশন না থাকলে বৃটেন কবে হিটলারের খপ্পরে চলে যেত! আমার নাস্তিক বন্ধুটির ক্রশ আঁকাটা রসিকতাব্যঞ্জক হলেও বক্তব্যটি কিন্তু সত্য।

রেডার হল 'রেডিও ডিটেক্‌শন অ্যাণ্ড রেন্‌জিং' (Radio detection and ranging) কথাটির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ—ইংরেজি শব্দগুলির প্রথমটির প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর এবং অন্যগুলির প্রথম অক্ষর নিয়ে রেডার (Radar) শব্দটি গঠিত। 'রেডিও ডিটেক্‌শন অ্যাণ্ড রেন্‌জিং'-এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল বেতার তরঙ্গের সাহায্যে কোন বস্তুর উপস্থিতি ও তার দূরত্ব নির্ধারণ। এই বস্তু বিমান, জাহাজ, পর্বত, অট্টালিকা ইত্যাদি হতে পারে। রেডার যন্ত্রের মাধ্যমে বস্তুর উপস্থিতি ও অবস্থান জানা যায় বলে রেডারকে মানুষের যান্ত্রিক দৃষ্টি বলা যেতে পারে।

রেডার কিভাবে কাজ করে

যে-কোন বস্তুর অবস্থান সাধারণতঃ আলোর সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত হয়। অথচ আমরা জানি, অন্ধকার গুহা-গহ্বরের মধ্যে কোথাও প্রতিহত না হয়ে বাদুড় স্বচ্ছন্দগতিতে উড়ে বেড়াতে পারে। এটা সম্ভব হয় কেমন করে? বাদুড় ওড়বার সময় শব্দোত্তর তরঙ্গের (Ultrasonic wave) সৃষ্টি করে। শব্দোত্তর তরঙ্গ সাধারণ শব্দ

তরঙ্গেরই মত, কেবল তার কম্পাঙ্ক (Frequency) অপেক্ষাকৃত বেশি এবং সেজন্যে তা মানুষের শ্রবণশক্তির এক্তিয়ারের বাইরে। যা হোক, বাদুড় যে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে, সেই তরঙ্গ কঠিন বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে তার কর্ণপটহে আঘাত করে এবং তা থেকে সে কঠিন বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। রেডারের কর্মক্ষমতার জন্যেও প্রায় একই রকমের কৌশল অবলম্বিত হয়—তবে শব্দোত্তর তরঙ্গের পরিবর্তে এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এই বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এর কম্পাঙ্ক বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কম্পাঙ্ক ১ গিগাহার্ৎজ (১০^{৯} হার্ৎজ) থেকে ১০ গিগাহার্ৎজের মধ্যে হয়, অর্থাৎ তরঙ্গটি মাইক্রো-তরঙ্গ, যার বিষয় পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ রেডার যন্ত্র তৈরি ও তার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যেই মাইক্রো-তরঙ্গ সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল।

রেডার ঠিক কিভাবে কাজ করে, ১নং চিত্র থেকে তা বোঝা যাবে। এই যন্ত্রের প্রেরক ব্যবস্থায় কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-তরঙ্গের এক-একটি পাল্‌স্ (Pulse) উৎপন্ন করা হয়। ১নং চিত্রে প্রেরক ব্যবস্থা থেকে নির্গত দুটি পাল্‌স্ দেখানো হয়েছে। কয়েকটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে তৈরি এই পাল্‌স্ স্বল্পকালীন কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। সময়ের মাপকাঠিতে এক-একটি পাল্‌সের দৈর্ঘ্য ০.১

১নং চিত্র—রেডার ও তার কার্যপ্রণালী
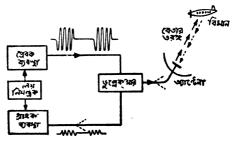
মাইক্রো-সেকেণ্ড থেকে ১০ মাইক্রো-সেকেণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। (১ মাইক্রো-সেকেণ্ড = $১০^{-৬}$ সেকেণ্ড)। প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি পাল্‌স্‌ উৎপন্ন হয়, তাদের সংখ্যা ২০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

প্রেরকে উৎপন্ন পাল্‌স্‌ ডুপ্লেক্‌সারে (Duplexer) এসে উপস্থিত হয়। ডুপ্লেক্‌সারে এমন সুইচের ব্যবস্থা থাকে যে, ঐ রকম একটি পাল্‌স্‌ এসে উপস্থিত হলেই গ্রাহকের দিকে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সম্পূর্ণ পাল্‌স্‌ চলে যায় অ্যাণ্টেনায়। সেখানে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পাল্‌স্‌ বেতার তরঙ্গের পাল্‌সে রূপান্তরিত হয়ে আকাশ-পথে প্রবাহিত হয়।

এখন ধরা যাক, ভূপৃষ্ঠে যেখানে রেডার রয়েছে, তার নিকটবর্তী আকাশে একটি বিমান এসে উপস্থিত হল। রেডার থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ বিমানে প্রতিফলিত হলে তার অংশবিশেষ ফেরৎ চলে আসে অ্যাণ্টেনায়। সেখানে বেতার তরঙ্গের পাল্‌স্‌ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পাল্‌সে রূপান্তরিত হয় এবং এবং সেই পাল্‌স্‌ ডুপ্লেক্‌সারে আসে। ডুপ্লেক্‌সারের সুইচ ব্যবস্থায় এখন গ্রাহকে যাবার পথ খোলা ও প্রেরকে যাবার পথ বন্ধ। সেজন্যে ঐ পাল্‌স্‌ গ্রাহক ব্যবস্থায় এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে পরিবর্ধিত হয়ে নির্দেশক অংশে তার আগমন-বার্তা জানিয়ে দেয়।

প্রেরক থেকে নির্গত প্রতিটি পাল্‌সের ক্ষেত্রে একই রকম ঘটনা ঘটে। এইভাবে আকাশে বিমানের উপস্থিতি রেডারের গ্রাহক ব্যবস্থার নির্দেশক থেকে জানতে পারা যায়।

আবার, প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি লয়-নিয়ন্ত্রক (Synchronizer) থাকে। প্রেরক থেকে প্রত্যেকটি পাল্‌স্‌ বেরনোর সময়কে এই নিয়ন্ত্রক নির্দিষ্ট করে দেয় এবং গ্রাহককে সেই সময় জানিয়ে দিয়ে তাকে সক্রিয় করে তোলে। এর কত পরে বিমান থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ অ্যাণ্টেনার মাধ্যমে গ্রাহকে এসে উপস্থিত হল, সেই সময়ের পরিমাপ জেনে রেডার থেকে বিমানের দূরত্ব সহজেই

হিসাব করা যায়। কারণ বেতার তরঙ্গের গতিবেগ আমাদের জানা আছে—এই গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান, প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার।

রেডারে যে অ্যাণ্টেনা ব্যবহৃত হয়, তা দিক-নির্ভর (Directional) অ্যাণ্টেনা—এটি থেকে যে বেতার তরঙ্গ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়, তার বেশির ভাগ অংশ প্রবাহিত হয় অ্যাণ্টেনার অক্ষের দিক বরাবর। আবার, অন্যান্য দিকের তুলনায় ঐ দিক থেকে আগত একই বেতার তরঙ্গ অ্যাণ্টেনায় অনেক বেশি সাড়া জাগায়। এই অ্যাণ্টেনাকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমাগত চারদিকে ঘোরানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম স্ক্যানিং (Scanning)। বিমান থেকে তরঙ্গ যখন প্রতিফলিত হচ্ছে, তখন অ্যাণ্টেনা কোন্ দিকে ঘোরানো আছে, তা লক্ষ্য করে আকাশের কোন্ দিকে বিমান আছে সেটা জানা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে অ্যাণ্টেনার এই দিক রেডারের গ্রাহক ব্যবস্থায় সরাসরি নির্দেশিত হয়। যেহেতু বিমানের দূরত্বও জানা আছে, অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, আকাশের ঠিক কোন্‌খানে বিমান রয়েছে, রেডারের সাহায্যে তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্দিষ্ট করা যায়।

কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রেডারে বেতার তরঙ্গের পাল্‌সের পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসাবে 'ডপ্‌লার রেডার' বা 'রেডার অল্‌টিমিটারের' উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন দ্রুতগামী বস্তুর গতিবেগ নির্ণয় করবার কাজে ডপ্‌লার রেডারের ব্যবহার আছে। বিমানে রক্ষিত রেডার অল্‌টিমিটারের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিমানটির উচ্চতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

রেডারের বৈশিষ্ট্য

রেডারকে মানুষের যান্ত্রিক দৃষ্টি বলা যায়—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল: খালি চোখে যতদূর দেখা সম্ভব, তা থেকে অনেক বেশি দূর পর্যন্ত এই দৃষ্টির ব্যাপ্তি। শুধু যে

রাত্রির অন্ধকারেই রেডারের দৃষ্টি অব্যাহত থাকে, তা নয়—ধোঁয়া, কুয়াশা, এমনকি হাল্কা মেঘও এর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। রেডারের সাহায্যে যতখানি নিখুঁত ভাবে কোন একটি বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায়, অতীতে বিজ্ঞানীদের তা কেবল কল্পনার বিষয় ছিল। রেডার চলমান বস্তুর গতিবেগও নির্ধারণ করতে পারে।

মানুষের চোখের কাছে এক বিষয়ে অবশ্য রেডারের পরাজয় ঘটেছে। চোখের মত অত বিশদ ভাবে কোন বস্তুকে রেডারে দেখা যায় না। সমুদ্রে যদি একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে, রেডারে তাকে দেখা যাবে; কিন্তু তার খুঁটিনাটি, অর্থাৎ তার ডেকের রেলিং, রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষ প্রভৃতি রেডারে বোঝা যাবে না। রেডারের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি যখন অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় কেবল একটি বস্তু উপস্থিত থাকে—যেমন, আকাশে একটি বিমান বা সমুদ্রের মাঝে একটি জাহাজ। তবে সাম্প্রতিক কালে সাংশ্লেষিক উন্মেষ রেডার (Synthetic aperture radar, সংক্ষেপে SAR) নামক বিশেষ ধরনের রেডার ব্যবহার করে দৃশ্যকে বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এই রেডারে প্রাপ্ত সংকেত থেকে উপযুক্ত কৌশলে দৃশ্যের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা হয়।

রেডারের উদ্ভাবন ও ক্রমবিকাশ

বেতার তরঙ্গ যে কঠিন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়, এই তথ্যটি এখন থেকে ৯২ বছর পূর্বে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ হাৎর্জ সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিলেন। রেডারের জন্ম কিন্তু এর অনেক পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রেডার উদ্ভাবিত হয়।

প্রয়োগবিদ্যায় যে সব যন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাদের অনেকগুলির মত রেডারেরও উৎপত্তির মূলে ছিল দুটি ঘটনা:—এক, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং দুই, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর প্রখর চিন্তাশক্তির প্রয়োগ। ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত বেতার তরঙ্গকে

আয়নমণ্ডলের প্লাজমা যে প্রতিফলিত করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়, সে কথা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে বেতার তরঙ্গের পাল্‌স্‌ উপর দিকে পাঠালে আয়নমণ্ডলের কোন প্লাজমা স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে সামান্য সময় পরে তা যখন ফিরে আসে, তখন সেই 'প্রতিধ্বনি' গ্রাহক ব্যবস্থার অসিলোস্কোপ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই ঘটনা থেকে ভূপৃষ্ঠ হতে ঐ প্লাজমা স্তরের দূরত্ব জানতে পারা যায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতির প্রচলন করেন বৃটিশ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড অ্যাপ্‌ল্‌টন ও এম. এ. এফ. বার্নেট। তাঁদের পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৯৩৫ সালে ইংল্যাণ্ডের বার্কিংহামশায়ারে রবার্ট ওয়াট্‌সন ওয়াটের নেতৃত্বে কয়েকজন বিজ্ঞানী আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন প্লাজমা স্তর সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। এই সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন, আয়ন-মণ্ডল থেকে প্রতিধ্বনি আসবার খানিক আগেই আরো কয়েকটি প্রতিধ্বনি অসিলোস্কোপে ধরা পড়ছে। ওয়াট্‌সন ওয়াট ভাবলেন, কাছাকাছি বাড়িঘর ও গাছপালা থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হওয়ায় এই সব প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হচ্ছে। তখন তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হল যে, আকাশে বিমান থাকলেও তো তা প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করবে এবং তাই থেকে বিমানের উপস্থিতি ও দূরত্ব জানা যাবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর ধারণা সমর্থিত হতেই তিনি বৃটেনের মন্ত্রী-সভাকে গোপনে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন এবং যুদ্ধের সময়ে এর অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করলেন। এই কাজের জন্যে ওয়াট্‌সন ওয়াটকে পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যা হোক, ওয়াট্‌সন ওয়াটের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ১৯৩৬ সালে রেডার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, বৃটেনের সমস্ত উপকূল জুড়ে গড়ে উঠল কয়েক শ' 'চেন হোম' রেডার স্টেশন। এই রেডারে অপেক্ষাকৃত বড় বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনা ছিল পৃথক।

বৃটেনে রেডার উদ্ভাবনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী, ফ্রান্স ও

অ্যামেরিকায় রেডার সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়। তবে রেডারের প্রবর্তনে বৃটেনের তাগিদ ছিল প্রথমে সবচেয়ে বেশি। বৃটিশ বিমান-বাহিনীর চেয়ে সে সময় জার্মান বিমানবাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। জার্মান বোমারু বিমানের বিরুদ্ধে বৃটেনের রক্ষাকবচের কাজ করলো রেডার। শত্রুপক্ষের বিমান বৃটেনের উদ্দেশ্যে হানা দিলেই কোন না কোন 'চেন হোম' স্টেশনে তা জানা যেত এবং সেই স্টেশন তখন সতর্কতা ঘোষণা করতো, বৃটিশ বাহিনীকে জানিয়ে দিত ঐ বিমানের উপস্থিতি ও অবস্থান।

এখানে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন মনে জাগে : রেডারে যখন কোন বিমানের উপস্থিতি ধরা পড়ে, তখন সেটি মিত্রপক্ষের বা শত্রুপক্ষের, তা কিভাবে জানা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে বিজ্ঞানীরা একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করলেন, যার নাম 'সনাক্তকরণ, মিত্র বা শত্রু'। এই ব্যবস্থায় মিত্রপক্ষের প্রত্যেক বিমানে বিশেষ ধরনের বেতার প্রেরক যন্ত্র রাখা হল। রেডারের বেতার তরঙ্গ বিমানে এসে লাগলেই ঐ যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় ভাবে কার্যকর হয়ে উঠতো এবং ঐ যন্ত্র থেকে বেতার সংকেত নির্গত হত। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত গ্রাহক যন্ত্রে এই সংকেত ধরা পড়ে জানিয়ে দিত, বিমানটি মিত্রপক্ষের।

রেডারের জীবনে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হল, বৃটিশ বিজ্ঞানীরা যখন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগ্‌নেট্রন টিউব আবিষ্কার করেন। রেডারে যে মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, উচ্চ শক্তিসম্পন্ন সেই তরঙ্গ ম্যাগ্‌নেট্রন টিউবের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব হল। এরপর যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যে আশ্চর্য দ্রুত গতিতে রেডারের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। যুদ্ধের পর-বর্তী কালে শান্তির সময়েও রেডারের ক্রমাগত উন্নতি অব্যাহত আছে।

রেডারের ব্যবহার

যুদ্ধে রেডারের ব্যবহার :—রেডারের সাহায্যে কেবল বিমানের অবস্থান জানাই নয়, একবার একটি বিমান দেখতে পেলে স্বয়ংক্রিয়

ব্যবস্থায় তার অনুসরণ করাও সম্ভব হল। বিমান ও জাহাজেও রেডার যন্ত্র রাখা হল—সেগুলির সাহায্যে অন্যান্য বিমান ও জাহাজের খোঁজ রাখা অনেক বেশি সহজ হল। দিক-নির্ণয়ের ব্যাপারেও রেডারকে কাজে লাগানো হল।

বিমানে যে রেডার রাখা হল, তা থেকে নিঃসৃত বেতার তরঙ্গ নিচের ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হত। দেখা গেল, ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি অনুযায়ী এই প্রতিধ্বনির তারতম্য হয়। যেমন ধরুন, কঠিন মাটি থেকে প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গের চেয়ে সমুদ্র থেকে প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গের তীব্রতা বেশি। ক্রমে রেডারের উন্নতির ফলে বিমানের নিচে ভূপৃষ্ঠের নদ-নদী, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ইত্যাদির অবস্থান বিমানের রেডার যন্ত্রের পর্দায় ধরা সম্ভব হল। ফলে রাত্রির অন্ধকারে শত্রু অঞ্চলে গিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে বোমা ফেলা বিমানের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়ে গেল। আমরা তো আগেই আলোচনা করেছি যে, রেডারের দৃষ্টি অন্ধকারেও সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে।

জাহাজে যে রেডার বসানো হল, নৌযুদ্ধকে তা দারুণ ভাবে প্রভাবিত করলো। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাটাপানের অদূরে ভূমধ্যসাগরে নৌযুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐখানে তখন ইতালীয় নৌবাহিনী পাহারায় ছিল। তাদের আক্রমণ করবার জন্যে রাত্রিবেলা ভূমধ্য-সাগর দিয়ে যখন কয়েকটি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল, তখন সেই জাহাজগুলির রেডারের পর্দায় প্রত্যেকটি ইতালীয় জাহাজের অবস্থান জানা যাচ্ছিল। ইতালীয় নৌবাহিনী কিন্তু তাদের বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। তারপর তাদের কাছাকাছি পৌঁছে বৃটিশ জাহাজ থেকে যখন নিখুঁত লক্ষ্য করে কামান দাগা শুরু হল, তখন বড় বিলম্ব হয়ে গেছে! সেই যুদ্ধে ইতালীয়দের শোচনীয় পরাজয় হল। বৃটিশ নৌবাহিনীর এই জয় ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অনেকাংশে সাহায্য করেছিল।

রাত্রিবেলা জাহাজ উপকূল থেকে যথেষ্ট দূরে থাকলেও জাহাজে

উন্নত ধরনের রেডার ব্যবহার করে তার পর্দায় উপকূলের বিশদ চেহারা দেখতে পাওয়া সম্ভব। সেজন্যে শত্রু-অধিকৃত কোন উপকূলের পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে সৈন্য নামিয়ে দেওয়া বা পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে কামানের গোলা বর্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

স্থলবাহিনীকেও রেডার নানাভাবে সাহায্য করে। রাত্রির অন্ধকারে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক, ট্রাক, জীপ, এমনকি পদাতিক সৈন্যকেও খুঁজে বের করবার কাজে রেডার ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনে রেডারের একটি চমকপ্রদ ব্যবহার হয়েছিল উড়ন্ত বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র বিনষ্ট করবার কাজে। ইংলিশ চ্যানেলের অপর পার থেকে জার্মানরা এমন ভাবে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ছিল, যাতে তা চ্যানেল পেরিয়ে বৃটেনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে সেখানে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে। এখন, জার্মানদের ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে উঠলেই বৃটেনের উপকূলস্থিত রেডারে তা ধরা পড়ছিল। সেই ক্ষেপণাস্ত্রের অবস্থান অনুযায়ী বেতার নিয়ন্ত্রিত দূরপাল্লার কামান ছুঁড়ে ক্ষেপণাস্ত্রটিকে আকাশ-পথেই বিনষ্ট করে দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল। এই ভাবে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেপণাস্ত্র বৃটেনের উপকূলে পৌঁছনোর আগেই আকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

শান্তিপূর্ণ কাজে রেডারের ব্যবহার :—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর রেডারের কর্মমুখরতা হ্রাস তো দূরের কথা, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে। রেডারে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সহযোগিতায় গত ২০-২৫ বছরে রেডারের কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে গেছে।

রেডার যে নানাবিধ কাজে নিয়োজিত আছে, সেগুলির মধ্যে দিক-নির্ণয়ের কাজই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত বড় বিমান বন্দরেই এখন রেডার যন্ত্র আছে। তাদের সাহায্যে বিমানের গতিবিধি তদারক করা হয়। প্রায় প্রত্যেকটি দূরগামী বিমান ও জাহাজে এখন রেডার থাকে। এই বিশেষ দৃষ্টিশক্তির কল্যাণে দূরপাল্লায় পাড়ি দেওয়া, বিশেষতঃ

বিমানে, অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে। অন্ধকারে বা কুয়াশার মধ্যেও পর্বত, সহর, সমুদ্র, নদী ইত্যাদির অবস্থান জানতে পারা যায়।

দিক-নির্ণয় প্রসঙ্গে রেডার বীকনের (Radar beacon) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূপৃষ্ঠে একাধিক নির্দিষ্ট স্থানে রেডার বীকন বসিয়ে তাদের সাহায্যে বিমান বা জাহাজের দিক-নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এই বীকনে একটি গ্রাহক যন্ত্র, একটি প্রেরক যন্ত্র ও একটি অ্যাণ্টেনা থাকে। ধরা যাক, কোন বিমানের রেডার থেকে নির্গত বেতার তরঙ্গ একটি বীকনে গৃহীত হল। এখন বীকনের গ্রাহক যন্ত্র থেকে সংকেত পেয়ে তার প্রেরক যন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং বীকনের অ্যাণ্টেনা থেকে বেতার তরঙ্গের পাল্‌স্‌ নির্গত হবে। এই পাল্‌স্‌ বিমানে গিয়ে পৌঁছলে বিমানের রেডার যন্ত্রে তা লক্ষ্য করে বীকন থেকে বিমানের দূরত্ব জানা যাবে। এইভাবে একাধিক বীকন থেকে বিমানের দূরত্ব জানলে আকাশে বিমানের অবস্থান নির্দিষ্ট করা যায়, কারণ ভূপৃষ্ঠে ঐ বীকন-গুলির অবস্থান আগে থাকতেই জানা আছে। কোন্ বীকন থেকে কোন্ পাল্‌স্‌টি এসছে, তা বোঝবার জন্যে সাধারণতঃ এক-একটি বীকন থেকে এক-একটি নির্দিষ্ট ধরনের পাল্‌স্‌ উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা থাকে। বিমানের রেডারের পর্দায় পাল্‌সের চেহারা দেখে বোঝা যায়, কোন্ বীকন থেকে সেটি এসেছে।

আবহাওয়ার খোঁজখবর রাখবার ব্যাপারেও রেডারকে কাজে লাগানো হয়। কোথাও যদি মেঘের আবির্ভাব ঘটে, অনেক দূর থেকেই রেডারে তা জানতে পারা যায়। কালবৈশাখী'র ঝঞ্ঝার বেশ কিছুক্ষণ আগেই রেডারে তার সংকেত মেলে। জি. আর. নিকল নাম একজন বিজ্ঞানীকে আমি জানি, তিনি ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল রেডার এস্ট্যাব্লিশ-মেণ্টে কাজ করতেন। বায়ুমণ্ডলে বরফ যেখানে দানা বেঁধে নিচে নামতে থাকে, রেডারের সাহায্যে সেই জায়গায় বরফের দানাগুলির গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

রেডারের আর একটি অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি অবশ্য

ঘটে আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনের উপকূলস্থিত রেডার যন্ত্রে একটি নতুন ধরনের সংকেত ধরা পড়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল, প্রতারণার উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষ ঐ সংকেত সৃষ্টি করছে। বিশ্লেষণ করে পরে বোঝা গেল, ব্যাপারটি তা নয়, সংকেতের মূলে রয়েছে সূর্য থেকে আগত বেতার তরঙ্গ। বস্তুতঃ ঐ সময় একটি সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঘটনাটি থেকে জানা গেল, সূর্য থেকে আলোক-রশ্মির মত বেতার তরঙ্গও নিয়মিত পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হচ্ছে। ফলে সূর্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের একটি নতুন পন্থা উদ্‌ঘাটিত হল।

এই ধরনের আরেকটি আকস্মিক যোগাযোগের ফলে যাযাবর পাখীদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই পাখীরা যখন দলে দলে দেশান্তরে যাত্রা করে, রেডারের ছবি থেকে তাদের তখনকার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নানাপ্রকার তথ্যাদি জানতে পারা গেছে।

সাম্প্রতিক কালে মানুষ যে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে, তাদের অবস্থান জানবার জন্যে রেডারকে কাজে লাগানো হয়েছে। চন্দ্রের উদ্দেশ্যেও রেডার থেকে বেতার তরঙ্গ প্রেরিত হয়েছে, সেই তরঙ্গ ফিরে আসবার পর তাকে বিশ্লেষণ করে চাঁদের বহিরাবরণ সম্পর্কে কিছু কিছু আভাসও পাওয়া গেছে।

মহাকাশযানের মাধ্যমে সৌরজগতের কয়েকটি গ্রহ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে, এ কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু তারও আগে পৃথিবী থেকে ঐ গ্রহগুলিতে রেডারের বেতার তরঙ্গ পাঠানো হয়েছিল এবং সেই সব তরঙ্গ ফিরে এসে গ্রহগুলি সম্পর্কে অনেক নতুন কথা বিজ্ঞানীদের জানিয়েছে—এ খবর আমরা অনেকেই পাইনি। এই বিষয়টি নিয়ে এখন একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হবে।

রেডারের সাহায্যে অন্য গ্রহ নিরীক্ষণ

পৃথিবী থেকে চাঁদের তুলনায় শুক্র, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহের দূরত্ব

বহুগুণে বেশি। এজন্যে পৃথিবী থেকে চাঁদের সঙ্গে বেতার যোগাযোগের তুলনায় এই সব গ্রহের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ অনেক বেশি দুরূহ। সেটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় এই থেকে যে, পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ শুক্র যখন পৃথিবীর সব চেয়ে কাছাকাছি আসে, তখনো তার থেকে প্রতিফলিত রেডার তরঙ্গের পরিমাণ চাঁদ থেকে প্রতিফলিত রেডার তরঙ্গের পরিমাণের পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু গত কয়েক বছরে রেডারের এত বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে যে, শুক্র থেকে প্রতিফলিত সামান্য তরঙ্গেরও দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র তরঙ্গকেও বর্তমানে রেডারে ধরতে পারা যায়।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অ্যামেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌স্টিট্যুট অব টেক্‌নোলজির লিঙ্কন গবেষণাগারের বিজ্ঞানী প্রাইস ও তাঁর সহকর্মীরা সর্বপ্রথম শুক্র গ্রহ থেকে রেডার তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেন। তাঁদের পরীক্ষায় সাফল্যের আভাস পাওয়া যায়। এই ধরনের আরো দু' একটি পরীক্ষার পর উল্লেখযোগ্য সাফল্য লক্ষিত হয় ১৯৬১ সালে। তখন কেবল লিঙ্কন গবেষণাগারেই নয়, অ্যামেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইন্‌স্টিট্যুট অব টেক্‌নোলজি-র জেট প্রোপাল্‌সান গবেষণাগার, ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জড্রেল ব্যাঙ্ক স্টেশন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়াস্থিত ইন্‌স্টিট্যুট ফর ইলেক্‌ট্রনিক্স অ্যাণ্ড রেডিও-টেক্‌নিক্‌স্‌, এই সব স্থানের বিজ্ঞানীরাও পৃথকভাবে রেডারের সাহায্যে শুক্রের সঙ্গে ভাল ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হন। শুক্রের পর রেডারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বুধের উপর। ১৯৬২ সালের জুন মাসে ক্রিমিয়াস্থিত ইন্‌স্টিট্যুটের বিজ্ঞানী কোটেল্‌নিকভ ও তাঁর সহকর্মীরা সর্বপ্রথম বুধ থেকে রেডারের প্রতিধ্বনি ধরতে সমর্থ হন। কয়েক মাস পরে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরা মঙ্গল গ্রহকেও রেডারের সাহায্যে নিরীক্ষণ করেন। ঐ সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় জেট প্রোপাল্‌সান গবেষণাগারের গোল্ডস্টাইন ও গিল্‌মোরও মঙ্গলের সঙ্গে রেডার যোগাযোগ করতে

পেরেছিলেন। আবার সেই বছরের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউ-নিয়ন ও অ্যামেরিকার ঐ দুই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীগোষ্ঠী বৃহস্পতি থেকে রেডারের প্রতিধ্বনি ধরতে পেরেছেন বলে জানান।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে, গ্রহগুলির সঙ্গে রেডার যোগাযোগের ফলে নতুন কী জানতে পারা গেছে। প্রথমতঃ, রেডার কর্তৃক দূরত্ব নির্ধারণে ভুলের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম বলে গ্রহগুলির কক্ষপথ আগের থেকে অনেক বেশি নিখুঁত ভাবে নির্দিষ্ট করা গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে দৈর্ঘ্যের যে একক ব্যবহার করা হয়—যা মোটামুটি ভাবে পৃথিবীর কক্ষপথের পরাক্ষের (Major axis) অর্ধেকের সমান—সেই এককের পরিমাপকেও রেডার পর্যবেক্ষণের ফলে অনেক বেশি নিখুঁত ভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। গ্রহগুলির দূরত্ব সম্পর্কে রেডার কর্তৃক সংগৃহীত জ্ঞানের ফলে ঐ সব গ্রহে বা গ্রহের কাছাকাছি মহাকাশযান পাঠানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রহদের ঘূর্ণনবেগ সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ঘূর্ণনবেগ নির্ণয় করা যায় দু'ভাবে : গ্রহ থেকে প্রতিফলনের দরুণ রেডার তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করে ঘূর্ণনবেগ হিসাব করা যেতে পারে অথবা গ্রহের কোন বিশেষ অঞ্চলের উপর রেডারের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সেই অঞ্চলটি কতখানি সরে যায়, তা লক্ষ্য করে তাই থেকে ঘূর্ণনবেগ সহজে হিসাব করা যায়। শুক্রের ঘূর্ণনবেগ রেডারের সাহায্যেই কেবল বিশ্বাসযোগ্য ভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। কারণ শুক্রের পৃষ্ঠদেশ ঘন আবহমণ্ডলে আচ্ছাদিত থাকায় তা আলোক-দূরবীণে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, কিন্তু রেডারের ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ ঐ আবহমণ্ডল ভেদ করে শুক্রের পৃষ্ঠদেশে পৌঁছতে পারে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে। রেডারের কাছ থেকে জানতে পারা গেছে যে, পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে যে দিকে ঘোরে, শুক্র ঘোরে তার বিপরীত দিকে আর তার অক্ষের চারপাশে একবার সম্পূর্ণ

ঘুরতে সময় লাগে প্রায় ২৪৩ দিন! পৃথিবী থেকে দেখলে শুক্র তার কক্ষপথ একবার সম্পূর্ণ অতিক্রম করতেও ঐ একই সময় নেয়। ফলে মজার ব্যাপার হল এই যে, শুক্র যখনই পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থানে আসে, তখন তার প্রায় একই পিঠ পৃথিবীর দিকে ঘোরানো থাকে। কেন যে এমন হয়, তার কোন সঙ্গত কারণ এখনো নির্দেশ করা যায় নি।

বুধ সূর্যের অত্যন্ত কাছে থাকায় আলোক দূরবীণের সাহায্যে তার গতি পর্যবেক্ষণ করা বেশ কঠিন। তবুও যা জানা গেছলো, তাতে প্রায় এক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, বুধ তার অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরতে সময় নেয় ৮৮ দিন এবং ঐ একই সময়ে সে তার কক্ষপথ একবার অতিক্রম করে। রেডার পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেল, অক্ষের চারপাশে ঘুরতে বুধের ৮৮ দিন লাগে না, লাগে তার তিন ভাগের দু' ভাগের মত অর্থাৎ প্রায় ৬০ দিন। এটা যে কেন হতে পারে, তার তত্ত্বগত ব্যাখ্যাও অনেকে পরে দিয়েছেন।

রেডারের সাহায্যে গ্রহগুলির বিষয়ে তৃতীয়তঃ যা জানা গেছে, তা হল তাদের পৃষ্ঠদেশের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে। রেডার তরঙ্গ গ্রহের পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রতিফলিত হলে তাই থেকে সেখানকার জমি কি রকম মসৃণ ও তার বৈদ্যুতিক ধর্ম কেমন, সেখানে পাহাড় পর্বত আছে কি না এবং থাকলে তাদের ঢাল কতখানি, ইত্যাদি নানা কথা জানতে পারা যায়।

চতুর্থতঃ, গ্রহের আবহমণ্ডল বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রেডার তরঙ্গকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার হলে শুক্রের আবহমণ্ডল কর্তৃক তরঙ্গের অনেকখানি শোষিত হয়। কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২০ সেন্টিমিটারের বেশি হলে এই শোষণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই ধরনের সব তথ্য থেকে গ্রহের আবহমণ্ডলের উপাদান ও গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে এটা উল্লেখযোগ্য যে, রেডারের সহায়তায় গ্রহের আকার, ভর প্রভৃতি সম্বন্ধেও তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়।

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল, তা হচ্ছে পৃথিবী থেকে রেডারের সাহায্যে অন্য গ্রহ নিরীক্ষণের বিষয়ে। এ ছাড়া কোন মহাকাশযান যখন কোন একটি গ্রহের কাছ দিয়ে যায়, তখন সেই যানে সংরক্ষিত রেডারের সাহায্যে ঐ গ্রহ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জেনে সেই খবর পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকতে পারে। ভবিষ্যতে মানুষ যখন অন্য গ্রহে পাড়ি দেবে, তখন রেডার হবে তার প্রয়োজনীয় সঙ্গী। অন্ধ লোক যেমন লাঠি ঠুকে ঠুকে ঠিক পথের নির্দেশ পান, সেইরকম মহাকাশচারীরা গ্রহের দূরের আকাশ থেকেই রেডারের সাহায্যে সঠিক পথের নির্দেশ পাবেন।

লেসার : আলোর আশ্চর্য উৎস

আলো আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের চারপাশের জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে আলো বিশেষ সাহায্য করে। আলোর নানান কার্যকলাপের কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি, কিন্তু আমরা সবাই জানি কি যে, আলোর সাহায্যে ইস্পাতের মত কঠিন পদার্থে নিমেষে গর্ত করে ফেলা যায়? মানুষের অক্ষিপটের কোন সূক্ষ্ম স্নায়ু ছিঁড়ে গেলে তা জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় কেবল আলো দিয়ে? যেখানে বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিসনের সংকেতকে বহন করার জন্যে বিভিন্ন বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করতে হয়, সেখানে একটি মাত্র আলোর তরঙ্গ একাই পৃথিবীর যাবতীয় রেডিও ও টেলিভিসনের সংকেতকে বহন করতে পারে? আলো পারে শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রকে আকাশ-পথেই একেবারে বিনষ্ট করে দিতে? আলোর এই সব আপাতঃ অসম্ভব কাণ্ডকারখানা সম্ভবপর হওয়ার মূলে রয়েছে লেসার নামক আলোর এক আশ্চর্য উৎসের আবিষ্কার।

সাধারণ আলোর সব উৎস থেকে লেসারের কী এমন পার্থক্য যে, সাধারণ আলো যা পারে না, লেসারের আলো তা অনায়াসে করতে পারে? এটা বুঝতে হলে আলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথমে দু' একটা কথা জেনে নিতে হয়।

সাধারণ আলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি

আমাদের জানা আছে, পরমাণুর মাঝখানে একটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং তার চারপাশে আবর্তন করে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনগুলি কয়েকটি সম্ভাব্য কক্ষপথে থাকতে পারে। পরমাণুর

স্বাভাবিক অবস্থায় সেগুলি থাকে যতখানি সম্ভব ভিতরের দিকের কক্ষপথে। যদি কোন কারণে একটি ইলেকট্রন ভিতরের কক্ষ থেকে বাইরের কোন কক্ষে চলে যায়, তাহলে পরমাণুটির শক্তি স্বাভাবিক অবস্থার থেকে বেশি হয়, অর্থাৎ বলা যেতে পারে পরমাণুটি উঠে পড়েছে এক উচ্চতর শক্তি-স্তরে। পরমাণুর এই অবস্থাকে বলা হয় উত্তেজিত অবস্থা। যাই হোক, তার ঐ ইলেকট্রন উচ্চ-মার্গে থাকে খুব সামান্য সময়—এক সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। তারপর সে ফেরৎ চলে যায় ভিতরের কক্ষে। তখন পরমাণুটির শক্তি কমে যায়, অর্থাৎ বলা চলে, সে নিচের শক্তি-স্তরে নেমে পড়ে শান্ত হয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত শক্তি একটি আলোক-কণার রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে (১নং চিত্র)।
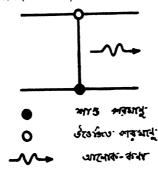
১নং চিত্র—আলোর নিঃসরণ

কোন কারণে অনেকগুলি পরমাণু উত্তেজিত হলে তাদের শান্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একই সময়ে ঘটে না, ঘটে যথেচ্ছভাবে। ঐ পরমাণুগুলি থেকে যে সব আলোক-কণা নির্গত হয়, তাদের নিঃসরণের ব্যাপারেও সেজন্যে সময়ের কোন স্থিরতা নেই। ঐ সব কণার সংমিশ্রণের ফলে যে আলোক-তরঙ্গের উদ্ভব, স্থান ও কালে তার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। এই ধরনের আলো সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। খুব একটা ছোট জায়গায় তাকে সংহত করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঐ

আলোক-তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট তরঙ্গের সমন্বয়ে ওটি গঠিত। সেকেণ্ডের হিসেবে কম্পাঙ্কের পার্থক্য ২×১০^{১৪}-এর মত একটি বিরাট সংখ্যা হতে পারে। (সেকেণ্ডে আলোর কম্পাঙ্ক প্রায় $১০^{১৫}$)। সাধারণ কোন শক্তিশালী উৎস থেকে নিঃসৃত আলোর শক্তি অনেকগুলি কম্পাঙ্কের তরঙ্গের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় কোন বিশেষ কম্পাঙ্কের তরঙ্গই যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে না। অথচ রেডিওর শব্দ বা টেলিভিসনের ছবির মত কোন সংকেতকে ঠিক ভাবে বহন করতে হলে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট তরঙ্গের প্রয়োজন; যেমন, আপনারা জানেন, আকাশবাণীর কলকাতা ক কেন্দ্রে যে বাহক বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, তার কম্পাঙ্ক নির্দিষ্ট—সেকেণ্ডে ৬৭০ কিলোহার্ৎজ। সাধারণ আলোর সাহায্যে সেজন্যে ঐ ধরনের কোন সংকেতকে পাঠানো যায় না।

লেসারে আলোর ধারার সৃষ্টি ও তার বৈশিষ্ট্য

আলোর নিঃসরণের যে প্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করা হল, তা হচ্ছে একটি স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous) প্রক্রিয়া। এ ছাড়া একটি উদ্রিক্ত (Stimulated) প্রক্রিয়াতেও আলোর নিঃসরণ সম্ভব। এই প্রক্রিয়াটির কথা সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ১৯১৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। আমরা জেনেছি, যখন কোন উত্তেজিত পরমাণু শান্ত হয়ে যায়, তখন একটি আলোক-কণার জন্ম হয়। এখন, একটি মজার ব্যাপার ঘটে, যদি ঐ কণার অনুরূপ একটি কণা এসে উত্তেজিত কোন পরমাণুকে আঘাত করে। সেই পরমাণু সঙ্গে সঙ্গে নিচের শক্তি-স্তরে নেমে পড়ে শান্ত হয়ে যায় এবং ঐ পরমাণু থেকে একটি আলোক-কণা নিঃসৃত হয়ে প্রথম কণাটিকে সঙ্গ দান করে। একেই বলা হয় আলোর 'উদ্রিক্ত নিঃসরণ' (Stimulated emission)। এই ক্ষেত্রে আপতিত ও নিঃসৃত আলোক-কণার

দশা (Phase) একই হয়—তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'টি তরঙ্গের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে।

যে উদ্রিক্ত নিঃসরণের কথা বলা হল, তাতে আলোর পরিবর্ধনও হতে পারে। কারণ উত্তেজিত পরমাণুর উপর আপতিত আলোর কণার সংখ্যা যেখানে এক, নিঃসরণের ফলে আর একটি কণা যোগ হওয়ায় ঐ সংখ্যা হয় দুই। সেই দু'টি কণা আবার দু'টি উত্তেজিত পরমাণুর উপর আপতিত হলে তাদের থেকে আরো দু'টি আলোক-কণা নিঃসৃত হয় এবং আলোক-কণার মোট সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় চার (২নং চিত্র)। এইভাবে কণার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে পারে অর্থাৎ আলোর পরিবর্ধন হতে পারে।
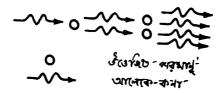
২নং চিত্র—আলোর পরিবর্ধন

এখানে অবশ্য একটি কথা আছে। যদি কোন আলোক-কণা উত্তেজিত পরমাণুর উপর না পড়ে কোন শান্ত পরমাণুর উপর পড়ে, তাহলে শান্ত পরমাণুটি ঐ কণাকে শোষণ করে নেবে। ফলে আলোক-তরঙ্গের পরিবর্ধন না হয়ে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। এজন্যে আলোর পরিবর্ধন কার্যতঃ সেই সব মাধ্যমেই কেবল সম্ভব, যেখানে শান্ত পরমাণুর চেয়ে উত্তেজিত পরমাণুর সংখ্যা বেশি। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় শান্ত পরমাণুর সংখ্যাই বেশি থাকে অর্থাৎ নিচের শক্তি-স্তরে পরমাণুর সংখ্যা বেশি, উপরের শক্তি-স্তরে পরমাণুর সংখ্যা কম। বিশেষ উপায়ে কোন মাধ্যমে এই সংখ্যার বিবর্তন (Population inversion) ঘটাতে পারলে অর্থাৎ উপরের শক্তি-স্তরে পরমাণুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি করতে পারলে তবেই আলোর পরিবর্ধন সম্ভব হয়।

এইরকম যে মাধ্যমে উদ্রিক্ত নিঃসরণের সাহায্যে আলোর পরিবর্ধন ঘটে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'লেসার'। Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (অর্থাৎ, বিকিরণের উদ্রিক্ত নিঃসরণের সাহায্যে আলোর পরিবর্ধন) —এই ইংরেজি বাক্যাংশের প্রধান শব্দ ক'টির প্রথম অক্ষরগুলি নিয়ে 'লেসার' (LASER) শব্দটি গঠিত।

লেসারের মধ্যে উদ্রিক্ত নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন আলোক কণাগুলি একই দশায় (Phase) থাকায় তাদের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত আলোক-তরঙ্গ স্থান ও কালে সুসমঞ্জস (Coherent)। বৈদ্যুতিক বাল্বের মত সাধারণ কোন উৎসের আলোর সঙ্গে লেসারের আলোর যে পার্থক্য, একটি উপমা দিলে হয়তো তা সহজে বোঝা যেতে পারে। ধরুন, পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে কয়েকটি ঢিল ছুঁড়ে ফেলা হল। তাহলে যে ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি হবে, তাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকবে না—সব মিলিয়ে একটা বিক্ষিপ্ত ধরনের তরঙ্গ গড়ে উঠবে। এই তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে সাধারণ উৎসের আলোক-তরঙ্গের। আর, যদি একটি ভারী পাথর পুকুরের জলে ফেলা হয়, তাহলে যে নিয়মিত তরঙ্গের সৃষ্টি হবে, তার সঙ্গে তুলনীয় হল লেসারের আলোক-তরঙ্গ।

লেসারের সুসমঞ্জস আলোকে খুব ছোট জায়গায় সংহত করা যায়। আবার লেসারে আলোর পরিবর্ধন হয় বলে এই আলো খুব তীব্র হতে পারে।

লেসারের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে যে সব বিশুদ্ধ তরঙ্গ রয়েছে, তাদের কম্পাঙ্কের পার্থক্য সামান্য—এমন কি প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র তিনও হতে পারে (যেখানে সাধারণ আলোর ক্ষেত্রে এটা হল ২×১০^{১০})। এজন্যে লেসারের আলোক-তরঙ্গকে প্রয়োগ করা যায় রেডিও বা টেলিভিসনের সংকেত বহন করবার কাজে।

লেসারের আবিষ্কার

যে প্রক্রিয়ায় লেসারে আলোর পরিবর্ধন হয়, সেই ধরনের প্রক্রিয়াতে আগেই মাইক্রো-তরঙ্গ নামক অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গের পরিবর্ধন সম্ভব হয়েছিল। যে যন্ত্রে এই পরিবর্ধন ঘটে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'মেসার' (MASER : Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)। মাইক্রো-তরঙ্গের মত আলোরও যে পরিবর্ধন সম্ভব, ১৯৫৮ সালে তত্ত্বগতভাবে তা প্রমাণ করেন মেসারের অন্যতম আবিষ্কর্তা সি এইচ টাউনেস ও তাঁর সহকর্মী এ এল স্যালো। এই বিষয়ে প্রায় একই সময়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানী এন জি বাসভ ও এ এম প্রোকোরভের গবেষণাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছ' বছর পরে, ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে এই বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করেন অ্যামেরিকার হিউজেস এয়ারক্র্যাফ্‌ট কোম্পানীর টি এইচ ম্যায়্‌মান। তিনি একটি চুনীর কেলাসকে লেসারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।

চুণী ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে লেসার তৈরি করা হয়েছে। সমধিক প্রচলিত যে 'হিলিয়াম-নিয়ন লেসার', তাতে নিম্ন চাপে হিলিয়াস ও নিয়ন গ্যাসের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ সৃষ্টি করে তাকে লেসারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৯৬১ সালে অ্যামেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের বিজ্ঞানী এ জাভান তাঁর দু'জন সহকর্মীর সহযোগিতায় সর্বপ্রথম এই লেজার তৈরি করেছিলেন।

চুনী লেসার

লেসার বাস্তবে কিভাবে কাজ করে, তা বোঝবার জন্যে ম্যায়্‌মানের তৈরী চুনী লেসারের (Ruby laser) কথা আলোচনা করা যাক। ৪ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও ৫ মিলিমিটার প্রশস্ত একটি চুনীর দণ্ডকে কুণ্ডলাকৃতি এক ঝলক বাতির (Flash lamp) মাঝখানে রেখে দেওয়া

হয় (৩নং চিত্র)। এই বাতিতে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা থাকে। চুনী দণ্ডের দু'টি শেষ প্রান্ত সযত্ন পালিশের ফলে অত্যন্ত মসৃণ ও পরস্পরের সমান্তরাল; তা ছাড়া সেগুলি এমন ভাবে রৌপ্য-খচিত যে, তাদের মধ্যে, একটি সম্পূর্ণভাবে আলোকে প্রতিফলিত করতে পারে—অন্যটিরও প্রতিফলন ক্ষমতা যথেষ্ট, তবে তার মধ্য দিয়ে আলোর কিয়দংশ নির্গত হতে পারে।

চুনীর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন ও ক্রোমিয়াম পরমাণু থাকে। ক্রোমিয়াম পরমাণুকে যদি কোন উপায়ে উত্তেজিত করা হয় অর্থাৎ উচ্চতর শক্তি-স্তরে তোলা হয়, তাহলে সে নিচের শক্তি-স্তরে ফেরৎ

৩নং চিত্র—চুনী লেসার
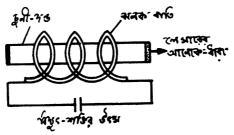
আসবার সময় প্রথমে এক আধাস্থায়ী (Metastable) অবস্থায় এসে খানিকক্ষণ যেন বিশ্রাম নেয়। সেখান থেকে যখন সে নিচের স্তরে নামে, তখন চুনীর লাল আলোক-কণা নিঃসৃত হয়।

এইবার, ৪নং চিত্র দেখলে চুনী লেসারের কর্মপদ্ধতি বুঝতে পারা যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় চুনীর পরমাণুগুলি শান্ত থাকে (ক)। বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগে ঝলক বাতির উদ্ভাসী আলো যখন চুনী-দণ্ডের উপর পড়ে (খ), তখন অধিকাংশ ক্রোমিয়াম পরমাণুই উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং আধাস্থায়ী অবস্থায় পরমাণুর সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। এই সময় পরমাণুগুলি থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আলোর নিঃসরণ হতে থাকে। চুনী কেলাসের অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে যখন কোন আলোক-

কণা নিঃসৃত হয়, তখন শুরু হয় লেসারের কাজ (গ); ঐ কণা কোন আধাস্থায়ী পরমাণুকে আঘাত করলে উদ্রিক্ত নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় সেই পরমাণু থেকে আর একটি অবিকল একই রকম আলোক-কণা বেরিয়ে

৪নং চিত্র—চুনী লেসারে আলোক-ধারার সৃষ্টি
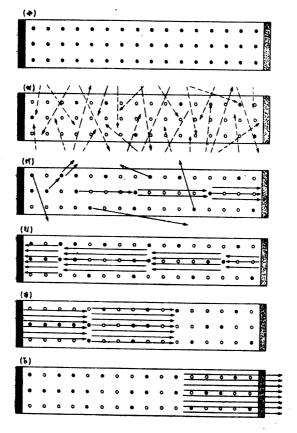
আসে। এইভাবে অক্ষের সমান্তরাল দিকে আলোর ধারা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। (অন্যান্য দিকে যে সব আলোক-কণা নিঃসৃত হয়, সেগুলি

বাইরে চলে যায়)। অক্ষের সমান্তরাল ধারাটি দণ্ডের এক প্রান্তে এসে পৌঁছলে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয় ও দণ্ডের অন্য প্রান্তের দিকে যেতে থাকে (ঘ) ; পথে উদ্রিক্ত নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় ঐ ধারার ক্রমাগতই পরিবর্ধন হতে থাকে। এইভাবে দণ্ডের দু'টি প্রান্ত থেকে আলোর ধারা প্রতিফলিত হয় এবং যতবার সে দণ্ডের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে, ততবার তার শক্তির পরিবর্ধন ঘটে (ঙ)। পরিবর্ধনের মাত্রা যথেষ্ট হওয়ায় চুনী দণ্ডের এক প্রান্ত দিয়ে লেসারের তীব্র আলোর ধারা নির্গত হয় (চ)।

বিভিন্ন ধরনের লেসার

নানারকম কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ ব্যবহার করে অনেক ধরনের লেসার তৈরি করা হয়েছে। চুনীর মত কেলাসিত পদার্থ ছাড়াও কাঁচের মধ্যে কোন উপযোগী উপাদানের বেশ কিছু পরমাণু ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁচ লেসার (Glass laser) উৎপন্ন করা গেছে। এই প্রসঙ্গে নিওডিমিয়াম-কাঁচ (Nd-glass) লেসারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই লেসার ব্যবহার করে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর অত্যন্ত শক্তিশালী আলোক-ধারা পাওয়া যায়। এটি কার্যকর হওয়ার মূলে রয়েছে কাচের মধ্যে নিহিত নিওডিমিয়াম আয়ন।

গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের মত কোন আধাপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করে যে ইনজেক্শান লেসার (Injection laser) তৈরি করা হয়েছে, তার সুবিধা এই যে, তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে তার আলোকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই লেস্যারে এন-টাইপ (n-type) ও পি-টাইপ (p-type), এই দু'রকম আধাপরিবাহীর দু'টি ছোট টুকরা সংযুক্ত হয়ে থাকে এবং তাদের সংযোগস্থল (Junction) লেসারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এন-টাইপ আধাপরিবাহীতে ঋণাত্মক (negative) আধানযুক্ত ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে, পি-টাইপ আধাপরিবাহীতে থাকে ধনাত্মক (positive) আধানযুক্ত হোল

(Hole)-এর আধিক্য। (আধাপরিবাহীর কোন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে যে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় হোল)। ইন্‌জেক্‌শান লেসারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে পি-এন সংযোগস্থলে পরিবাহী ইলেকট্রন ও হোলগুলি গতিশীল হয়। যখন কোন ইলেকট্রন একটি হোলের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তার শক্তি কিছুটা কমে যায় এবং উদ্বৃত্ত শক্তি একটি আলোক-কণা রূপে বেরিয়ে আসে। এই আলোক-কণা অন্য পরিবাহী ইলেকট্রনের উপর পড়লে সেও একটি হোলের সঙ্গে মিলিত হয় এবং উদ্রিক্ত নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় জন্ম হয় একটি নতুন আলোক-কণার। এইভাবে ক্রমাগত আলোর পরিবর্ধন হতে থাকে। পি-এন সংযোগস্থলের দু'টি প্রান্তকে মসৃণ ও সমান্তরাল রাখা হয় এবং তারা প্রতিফলকের কাজ করে। চুনী লেসারের মতই ঐ সংযোগস্থলের এক প্রান্ত দিয়ে লেসারের আলো বেরিয়ে আসে।

গ্যাস লেসারে বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। এই সংমিশ্রণের মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ সৃষ্টি করলে তা লেসারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। হিলিয়াম-নিয়ন লেসারে (He-Ne laser) সাধারণতঃ ৮ : ১ অনুপাতে হিলিয়াম ও নিয়ন গ্যাস মেশানো থাকে। এই লেসারে ব্যবহৃত দু'টি প্রতিফলক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষরণ-নলের বাইরে দু'ধারে রাখা হয়। সাম্প্রতিক কালে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেসারের (CO_2 laser) প্রভূত প্রচলন হয়েছে, কারণ এই লেসার থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী আলো অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া যেতে পারে। এতে ব্যবহৃত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে নাইট্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস মিশিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিপ্রভ রঞ্জক পদার্থের দ্রবণকে মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে যে লেসার তৈরি করা হয়, তাকে রঞ্জক লেসার (Dye laser) বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল—এ থেকে যে আলো নির্গত হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সহজেই বেশ কিছুটা (কয়েক শ' অ্যাংস্ট্রম) পরিবর্তন করা যায়।

লেসারকে সক্রিয় করবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা যেমন ঝলক বাতির উদ্ভাসী আলো বা বিদ্যুৎ-শক্তি থেকে পাওয়া যায়, তেমনই আবার রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত শক্তি থেকেও পাওয়া যেতে পারে। তাপমোচী (Exothermic) বিক্রিয়ায় যে তাপের উদ্ভব হয়, তাতে অনেকগুলি পরমাণু উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং এইভাবে লেসারের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যা-বিবর্তন সম্ভব হয়। এই ধরনের লেজারকে বলা হয় রাসায়নিক লেসার (Chemical laser)।

যে সব বিভিন্ন রকম লেসার তৈরি করা হয়েছে, সেগুলি ব্যবহার করে কেবল দৃশ্য আলোরই নয়, অতিবেগুনি ও অবলোহিত আলোরও সুসমঞ্জস তরঙ্গমালা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

লেসারের ব্যবহার

লেসারের কয়েকটি চমকপ্রদ ব্যবহারের কথা এই প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে। এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ সময়ে লেসারের তীব্র রশ্মি দিয়ে ট্যাণ্টালামের মত কঠিন ধাতুর পাতে গর্ত করে ফেলা যায়। লেসারের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আলোক-ধারাকে চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের জন্যে ছুরি হিসেবে ব্যবহার করেন (আর্ট প্লেটে ৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই আলো একটি নমনীয় যান্ত্রিক বাহুর মধ্য দিয়ে এসে বাইরে নির্গত হয়। ঐ বাহুকে চিকিৎসকরা প্রয়োজন অনুযায়ী নাড়াতে পারেন। এই ছুরি এত সূক্ষ্ম যে, দেহের রোগাক্রান্ত অংশের একটি মাত্র জীবকোষকেও এর সাহায্যে সরিয়ে ফেলা সম্ভব। আবার দেখুন, মানুষের অক্ষিগোলকের পিছন দিকে যে অক্ষিপট (Retina) আছে, তা কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বাইরে থেকে নিমেষের জন্যে তীব্র লেসার-রশ্মি ব্যবহার করে তা জোড়া দিয়ে দেওয়া যায় (আর্ট প্লেটে ৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

একটি নমনীয় আলোকবাহী নলের মাধ্যমে লেসারের আলো পাঠিয়ে এবং এই নলের অগ্রভাগ দিয়ে আলোর সূক্ষ্ম ধারা নির্গত হবার ব্যবস্থা

করে 'লেসার পেন্সিল' তৈরি করা হয়েছে (আর্ট প্লেটে ৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই পেন্সিল দিয়ে আলোক-সংবেদী ফলকে লিখে ফেলা যায়। সেই লেখা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের স্মৃতি-অংশ বা তথ্যাদি সঞ্চয় করে রাখবার অন্যান্য ব্যবস্থায় এই পেন্সিল ব্যবহারের প্রচেষ্টা হচ্ছে।

কোন বস্তুর উপস্থিতি ও দূরত্ব নির্ণয়ের জন্যে রেডারের বেতার তরঙ্গের পরিবর্তে লেসারের সুসমঞ্জস আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্যে এ যন্ত্র তৈরী হয়েছে, তার নাম 'কলিডার' (Colidar: Coherent Light Detection And Ranging)। কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে কোন বস্তুর অবস্থান কলিডারের সাহায্যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জানা যায়। মহাকাশযানকে আকাশে পাঠাবার জন্যে যে রকেট ব্যবহার করা হয়, যে-কোন সময়ে তার অবস্থান এই যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারা যায়। আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করবার কাজেও এর প্রয়োগ হয়েছে।

মহাকাশচারীরা যখন চাঁদে গেছলেন, তখন সেখানকার মাটিতে লেসার আলোর প্রতিফলক বসিয়ে দেন। পৃথিবী থেকে কলিডারের রশ্মি পাঠালে তা প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফেরৎ আসে। সেই রশ্মির যাতায়াতে যে সময় লাগে, তার পরিমাপ থেকে পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। আগে এই পরিমাপে সম্ভাব্য ত্রুটি ছিল ৮০ কিলোমিটার, কলিডারের ব্যবহারে সম্ভাব্য ত্রুটি দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার।

যুদ্ধের কাজে লেসারের বহুল প্রয়োগ আছে। এর সাহায্যে একদিকে যেমন ক্ষেপণাস্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অন্যদিকে তেমন আকাশ-পথেই ক্ষেপণাস্ত্রকে বিনষ্ট করা সম্ভব। লেসার রশ্মি ব্যবহার করে ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট দিকে কামানের গুলি ছুঁড়ে শত্রু পক্ষের বিমান, হেলিকপ্টার বা ট্যাংক ধ্বংস করে ফেলা যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেসারের আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা আগেই

বলা হয়েছে। অনেকগুলি টেলিফোনের সংকেতকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লেসার রশ্মির ব্যবহার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অ্যামেরিকার ফ্লোরিডায় ওয়াল্ট ডিস্‌নি জগতে সম্প্রতি যে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আলোক বহনকারী ফাইবার অপ্‌টিক (Fibre optio) তার মাটিতে বসানো হয়েছে, তা ৩,৩০০ টেলিফোনের সংকেতকে একসঙ্গে বহন করতে পারে। এই তারের আকার আগেকার তামার তারের আকারের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বড় বড় সহরে এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা সহজেই বোঝা যায়।

প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন পদার্থ থেকে যে বিশেষ রকম বিচ্ছুরিত আলোর সন্ধান পান, তার সাহায্যে পদার্থটির আণবিক গঠন সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য জানতে পারা যায়। এই বিচ্ছুরিত আলোর কম্পাঙ্ক আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক থেকে পৃথক হয়। যা হোক, অনেক পদার্থের ক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত আলো এত ক্ষীণ যে, তার হদিশ পাওয়া শক্ত। এখন, ঐ রকম পদার্থের উপর যদি কোন লেসারের তীব্র রশ্মি ফেলা হয়, তাহলে 'উদ্রিক্ত রামন নিঃসরণ' প্রক্রিয়ায় যে বিচ্ছুরিত আলো নির্গত হয়, তা যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় তাকে সহজেই ধরা যায়। আবার, এই আলো সুসমঞ্জস বলে বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করে ও তাদের উপর লেসারের আলো ফেলে বিভিন্ন কম্পাঙ্কে লেসার তরঙ্গ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

আমরা জানি, আলোর তরঙ্গ হচ্ছে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ অর্থাৎ তার মধ্যে স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। লেসারের আলো অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে বলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিও অত্যন্ত প্রবল হওয়া সম্ভব। এত প্রবল ক্ষেত্র সৃষ্টি করা আগে বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঐ সব প্রবল ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পদার্থের ধর্ম কেমন ভাবে পরিবর্তিত হয়, তা অনুসন্ধানের জন্যে পদার্থবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা গড়ে উঠেছে। এই শাখার নাম 'অরৈখিক আলোক-বিজ্ঞান' (Non-linear optics)।

লেসারের যে ব্যবহার সাধারণ মানুষের কাছে বোধহয় সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, তা হল ত্রৈমাত্রিক ছবির সৃষ্টি। এখন এই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হবে।

ত্রৈমাত্রিক ছবির সৃষ্টি

যে বস্তু যেমন দেখতে, তার ছবিকে যদি অবিকল একই রকম হতে হয়, তবে সেই ছবিকে হতে হবে ত্রৈমাত্রিক (Three-dimensional)। ত্রৈমাত্রিক ছবি তৈরীর বিদ্যাকে বলা হয় হলোগ্রাফি (Holography)। এর মাধ্যমে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্দেশক সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যায়। গ্রীক শব্দ 'হোলোস' থেকে 'হলোগ্রাফি' শব্দটির উৎপত্তি; 'হোলোস' শব্দের অর্থ: সম্পূর্ণ।

হলোগ্রাফি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করার জন্যে অধ্যাপক ডেনিস গ্যাবর ১৯৭২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ২৫ বছর আগেই ১৯৪৭ সালে তিনি ত্রৈমাত্রিক ছবি সৃষ্টির কৌশল উদ্ভাবন করেন, কিন্তু উপযুক্ত আলোক-উৎসের অভাবে এই কৌশল তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। ১৯৬০ সালে লেসার আবিষ্কারের পর হলোগ্রাফিতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। লেসারের সুসমঞ্জস আলো ত্রৈমাত্রিক ছবি তৈরীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কোন বস্তুর ত্রৈমাত্রিক ছবি সৃষ্টির কাজটি দু' ধাপে করা হয়। প্রথম ধাপে বস্তুটির সব অংশ থেকে আগত আলোক-তরঙ্গকে বিশেষ পদ্ধতিতে একটি আলোক-চিত্রের ফলকের উপর লিপিবদ্ধ করা হয়। এইভাবে যা তৈরী হল, তার নাম হলোগ্রাম। দ্বিতীয় ধাপে হলোগ্রামের উপর যথোপযুক্ত আলো ফেলে তাই থেকে বস্তুটির সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি পুনরুদ্ধার করা হয়।

হলোগ্রাম কিভাবে তৈরি করা হয়, ৫নং চিত্র দেখলে তা বোঝা যাবে। লেসার টর্চ থেকে যে আলো নির্গত হয়, একটি বিশেষ দর্পণ তার রশ্মিগুচ্ছকে দু' ভাগে ভাগ করে দেয়। এক ভাগ রশ্মিগুচ্ছ ১নং

ও ২নং দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয় এবং ১নং লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট বস্তুর উপর পড়ে। বস্তুটি কর্তৃক অপবর্তিত (Diffracted) আলোর তরঙ্গমালা গিয়ে আপতিত হয় একটি বিশেষ আলোকচিত্রের ফলকের উপর। দ্বিতীয় ভাগ রশ্মিগুচ্ছ ৩নং দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে ও ২নং লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার প্রতিফলিত হয় ৪নং দর্পণে। সেই প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গও আপতিত হয় আলোকচিত্রের

৫নং চিত্র—হলোগ্রাম গঠন
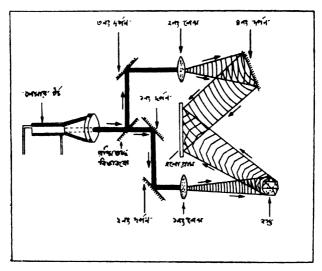
ফলকটির উপর। দুই তরঙ্গমালার মিশ্রণে ফলকটির উপর যে ব্যতিচার নক্সা (Interference pattern) গড়ে ওঠে, তারই মধ্যে নিহিত থাকে বস্তুটির ত্রৈমাত্রিক ছবি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। এই নক্সাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফলকটির উপর মুদ্রিত করা হয়। এইভাবে তৈরী হয় হলোগ্রাম।

হলোগ্রাম থেকে বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি ৬নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। হলোগ্রাম তৈরীর সময় যে লেসার টর্চ ব্যবহার

করা হয়েছিল, ঠিক সেই রকম একটি লেসার টর্চের আলোক-তরঙ্গকে লেন্সের মধ্য দিয়ে ফেলা হয় হলোগ্রামের উপর। তখন হলোগ্রাম থেকে নির্গত আলো বস্তুটির ত্রৈমাত্রিক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এই প্রতিবিম্ব বাস্তব (Real) বা অলীক (Virtual) হতে পারে। হলোগ্রামের মধ্য দিয়ে দেখলে যে অলীক প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তা বস্তুটির অবিকল প্রতিকৃতি।
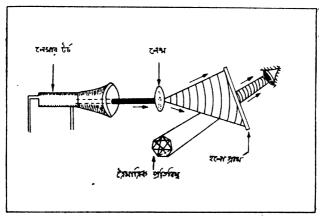
৬নং চিত্র—হলোগ্রাম থেকে বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি পুনরুদ্ধার

বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প, মানচিত্র গঠন ইত্যাদি কাজে হলোগ্রাফির প্রভূত প্রয়োগ হচ্ছে। একে ব্যবহার করে ভবিষ্যতে হয়তো আমরা ত্রৈমাত্রিক সিনেমা দেখতে পাব। সেই সিনেমায় ছবি দেখাবার জন্যে কোন পর্দা থাকবে না—শূন্যস্থানেই ফুটে উঠবে মানুষ, ঘরবাড়ি, গাছ-পালা ইত্যাদির নিখুঁত ত্রৈমাত্রিক ছবি।

কম্পিউটারের আত্মকাহিনী

কলকাতার পথে ঘাটে আপনারা অনেকেই বোধহয় আমাদের বিরুদ্ধে পোস্টার দেখেছেন, খবরের কাগজের 'সম্পাদক সমীপেষু' চিঠি পড়ে হয়তো বিক্ষুব্ধও হয়েছেন আমাদের উপর। অফিসে বা কারখানায় আমাদের নিয়োগ করলে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে (কত বেড়ে যাবে, তা সহজে হিসেব করতে হলে অবশ্য আমাদেরই সাহায্য নিতে হবে), এই হল আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

কম্পিউটারদের পক্ষ থেকে আমি এখন এই অভিযোগের উত্তর দিতে চাই। তবে সমস্ত ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে বোঝবার জন্যে আমাদের বংশপরিচয় প্রথমে আপনাদের জানতে হবে, জানতে হবে কেমন করে ও কীসের জন্যে আমাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। মনুষ্যত্বের সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের যে মস্তিষ্করূপ অঙ্গ, আমরা যে তার একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ অংশস্বরূপ, এই সত্যটি আপনারা যাতে উপলব্ধি করতে পারেন, সেজন্যে আমাদের কাজ কী ও কিভাবে আমরা তা করি, তা আপনাদের শোনাব। মানুষের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগে আমরা তাকে কত ভাবে সাহায্য করছি, সত্যের খাতিরে নিজেদের সেই গুণ-কীর্তনও আমাকে কিঞ্চিৎ করতে হবে। আর তারপর আপনাদের বুঝিয়ে দেব, আসল অভিযোগ যদি থাকে তো, তা আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের নয়, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের।

বংশপরিচয়

যে সব স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে মনুষ্যসভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, গণিত নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের মূল কাজ হচ্ছে সেই

গণিতের সমস্যার সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা। এই কাজ দু' ভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট রাশিগুলিকে বিচ্ছিন্ন সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করে: যেমন, ধরা যাক, একটি পাত্রে কিছু তেল ঢালা হয়েছে, আপনি আরও খানিকটা তেল ঢাললেন (তেলা মাথাতে তেল দেওয়াই কি আপনাদের সমাজের রেওয়াজ নয় ?), তাহলে তেল মোট কতটা হল ? এখানে আগে যে তেল ঢালা হয়েছিল ও আপনি যা ঢাললেন, তাদের সংখ্যায় (অর্থাৎ এত কিলোগ্র্যাম, এত গ্র্যাম ইত্যাদিতে) প্রকাশ করে উত্তরটি সংখ্যার মাধ্যমে জানতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সংশ্লিষ্ট রাশিগুলির পরিমাপের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে বিদ্যুচ্চাপ বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত কোন অবিচ্ছিন্ন রাশি ব্যবহার করে গণনার কাজটি করা হয়। এই দু'টি পদ্ধতি অনুযায়ী কম্পিউটারকুলেরও দুই ধারা: প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে যারা গণনা করে, তাদের বলা হয় ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক কম্পিউটার, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি যারা ব্যবহার করে, তাদের বলা হয় অ্যানালগ বা সাদৃশ্যাত্মক কম্পিউটার।

প্রায় ২৫,০০০ বছর আগে সংখ্যা সম্বন্ধে মানুষের প্রথম ধারণা জন্মায় এবং হাতের আঙুলের সাহায্যে সে গুণতে শেখে। তারপর ধীরে ধীরে তার গণনা পদ্ধতির উন্নতি হতে থাকে। প্রথম যে উল্লেখ-যোগ্য গণকযন্ত্রটি মানুষ উদ্ভাবন করে, তার নাম অ্যাবাকাস। সে প্রায় ২,৫০০ বছর আগেকার কথা। এই যন্ত্রে সারিবদ্ধ কয়েকটি নুড়ি বা কাঠের বল ব্যবহার করে গণনা করা হত। অনেক দেশে এখনো অ্যাবাকাসের প্রচলন আছে। এই অ্যাবাকাস হল সংখ্যাত্মক কম্পিউটারদের আদিপুরুষ, আর সাদৃশ্যাত্মক কম্পিউটারদের আদিপুরুষ বলা চলে স্লাইড রুলকে—যার সঙ্গে আপনারা অনেকেই হয়তো পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্কটল্যাণ্ডের জন নেপিয়ার এর জন্ম দেন আর তারপর একে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম আউট্রেড।

যাই হোক, যে কম্পিউটারদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ,

তারা প্রায় সবাই সংখ্যাত্মক এবং আমি নিজেও তাদের দলে। সেজন্যে সংখ্যাত্মক কম্পিউটারদের কথাই আমি কেবল বলব। (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, আমাদের জ্ঞাতিরা আমাদের থেকে সাধারণতঃ অধিকতর দ্রুত কাজ করতে বটে, কিন্তু আমাদের সমাধান তাদের থেকেও অপেক্ষাকৃত নিখুঁত এবং তাদের আওতায় যত রকমের সমস্যা পড়ে, আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি রকমের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি। টাকা-পয়সার হিসেবে আমাদের দরও সাধারণতঃ বেশি। আপনারা যাঁরা অর্থসর্বস্ব সমাজে বাস করেন—নিশ্চয় বুঝবেন যে, আমরাই বেশি সম্মানের পাত্র। যে বুদ্ধিমানের 'Meritocracy' অর্থাৎ গুণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁরাও আমাদের বেশি কদর দেন।)

সংখ্যাত্মক কম্পিউটারের বংশে অ্যাবাকাসের পরে জন্ম নিল ডেস্ক ক্যাল্‌কুলেটর—সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্লেজ পাস্‌কেল ও গট্‌ফ্রিড উইল্‌হেল্‌ম লাইব্‌নিৎজ গিয়ার-সমন্বিত এই ক্যাল্‌কুলেটর উদ্ভাবন করেন। অতঃপর উল্লেখযোগ্য অবদান ঘটল প্রায় দু' শতাব্দী পরে। কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ প্রথমে একটি 'পার্থক্য নির্ধারক যন্ত্র' ও পরে একটি 'বিশ্লেষক যন্ত্রের' পরিকল্পনা করেন। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল গাণিতিক তালিকা তৈরি করা। দ্বিতীয়টির পরিকল্পনা ছিল আরো উন্নত ধরণের: যোগ, গুণ, ভাগ, এসব করা ছাড়াও সে যাতে যথাযথ হুকুম তামিল করতে পারে, সেজন্যে তার যুক্তিশক্তি-সমন্বিত একটি অংশ থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এদিক থেকে যন্ত্রটিকে বর্তমান কম্পিউটারদের সমতুল্য বলা চলে। গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্যে ঐ যন্ত্রের যে অঙ্গ, ব্যাবেজ তাকে গণিতের কারখানা বলতেন। দুঃখের বিষয়, যন্ত্র দু'টির জন্যে যে সব সূক্ষ্ম কলকব্জার প্রয়োজন ছিল, ব্যাবেজের সময়ে তাদের অধিকাংশই পাওয়া যেত না; ফলে ব্যাবেজ তাঁর দু'টি যন্ত্রের কোনটিই সমাপ্ত করতে পারেন নি।

কম্পিউটারদের পরবর্তী বংশধরের জন্ম অ্যামেরিকার আদমসুমারীর দপ্তরখানায়। ১৮৮০ সালে অ্যামেরিকায় যে লোকসংখ্যা গণনা করা

হয়, তার হিসেব শেষ করতে ৭ বছর লেগে যায়। বোঝা গেল, যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে, গণনার গতি না বাড়ালে ভবিষ্যতে আদম-সুমারী শেষ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। নতুন এক গণক-যন্ত্রে প্রচ্ছিন্ন (Punched) কার্ড ব্যবহার করে সেই সমস্যার সমাধান করলেন হার্মান হল্যারিথ। ঐ সব কার্ডে এক একটি ছিদ্রের অবস্থান এক একটি সংখ্যাকে নির্দেশ করতো। কাপড়ে বিভিন্ন নক্সা বোনবার সুবিধার জন্যে ফরাসীদেশের জোসেফ এম জ্যাকার্ড তাঁতযন্ত্রে সর্বপ্রথম প্রচ্ছিন্ন কার্ড ব্যবহার করেন। গণকযন্ত্রে ঐ ধরণের কার্ড ব্যবহার করবার প্রস্তাব ব্যাবেজ করেছিলেন, তবে হল্যারিথই প্রথম সেই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। হল্যারিথের যন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, তাতে প্রচ্ছিন্ন কার্ডের ব্যবহারে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগ ঘটলো।

এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে ইলেকট্রনিক্সের প্রয়োগে কম্পিউটারকুলে নতুন সব বংশধর দেখা দিতে লাগল। ইতিমধ্যে প্রতীকধর্মী যুক্তিশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ক্লড শ্যাননের গবেষণার ফলে ঐ যুক্তিশাস্ত্রকে ভিত্তি করে কম্পিউটারকে যুক্তিসম্পন্ন করা হল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা হল কম্পিউটারের। কম্পিউটার আর শুধু কর্মী রইলো না, চিন্তাশীল হয়ে উঠলো। ঐ ধরনের প্রথম কম্পিউটার তৈরি করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র—কালিন ও বুর্থার্ট। আমাদের মধ্যে যারা আধুনিক সংখ্যাত্মক কম্পিউটার বলে পরিচিত, তাদের সর্বপ্রথমটির জন্ম পেন্সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। যন্ত্রটির নাম এনিয়াক (ENICA : Electronic Numerical Integrator And Computer), জন্ম সন ১৯৪২ সাল। এটি পূর্ণতা লাভ করে ১৯৪৬ সালে; তখন এতে ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০, ওজন ৩০ টন, প্রতি সেকেণ্ডে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ ১৫০ কিলোওয়াট।

এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের জন্মের পর কয়েক বছরের মধ্যেই এই ধরনের বহু কম্পিউটারের সৃষ্টি হল। বর্তমানে

কম্পিউটার বলতে সাধারণতঃ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারকেই বোঝানো হয়।

উনিশ শ' পঞ্চাশের দশকে কম্পিউটারে ভাল্‌বের পরিবর্তে ট্র্যান্‌জিস্টর ব্যবহার করা শুরু হল। এতে কম্পিউটারের আকার বেশ খানিকটা ছোট হল। যে সব কম্পিউটারে ভাল্‌ব ব্যবহার করা হয়, তাদের বলা যায় প্রথম পুরুষ (First Generation) কম্পিউটার। আর যে কম্পিউটারগুলিতে ট্র্যান্‌জিস্টর ব্যবহৃত হয়, তাদের দ্বিতীয় পুরুষ কম্পিউটার বলা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে কম্পিউটার-কুলে তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এদের নাম মিনি-কম্পিউটার। এদের আকার অনেক ছোট, কারণ এগুলিতে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এক একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট একাধিক ট্র্যান্‌জিস্টর, ডায়োড ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উপাদানের কাজ একসঙ্গে করতে পারে, অথচ এটি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র—হয়তো মাত্র এক ঘন মিলিমিটার হতে পারে।

আবার, একেবারে সাম্প্রতিক কালে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের উন্নত সংস্করণ হিসেবে মাইক্রো-প্রসেসর নামে এইরকম ছোট্ট জিনিষ তৈরি হয়েছে, যা একাধারে কয়েক হাজার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদানের কাজ করতে পারে। একটি বা কয়েকটি মাইক্রো-প্রসেসর দিয়ে মাইক্রো-কম্পিউটার বা অতি ক্ষুদে কম্পিউটার গঠিত হচ্ছে।

আমরা কিভাবে কাজ করি

আপনি যতক্ষণ এই বাক্যটি পড়ছেন, আমি সেই সামান্য সময়ে কয়েক লক্ষ যোগ বিয়োগ করে ফেলতে পারি। এজন্যে আমাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'বিশাল মস্তিষ্ক'। আমরা কিভাবে কাজ করি, ১নং চিত্র দেখলে তা খানিকটা বোঝা যাবে। আমাদের পাঁচটি অঙ্গ—অন্তর্দ্বার (Input), স্মৃতি (Memory), নিয়ন্ত্রক (Control unit), পাটীগণিত (Arithmetic unit) ও বহির্দ্বার (Output)। যে

সমস্যার আমাদের সমাধান করতে হবে, সেই সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলি অন্তর্দ্বারের মধ্য দিয়ে স্মৃতিতে উপস্থিত হয়ে সেখানে সঞ্চিত হয়। অতঃপর গাণিতিক প্রক্রিয়ার যথাযথ ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক অঙ্গ স্মৃতি থেকে তথ্যাদি পাঠিয়ে দেয় পাটীগণিত অঙ্গে; সেখানে প্রয়োজনীয় যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। ফলাফলগুলি নিয়ন্ত্রক সংকেতে আবার স্মৃতিতে চলে গিয়ে সেখানে সঞ্চিত থাকে। পরিশেষে নিয়ন্ত্রক অঙ্গের নির্দেশে সমস্যার সমাধান স্মৃতি থেকে বহির্দ্বারের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যায়।
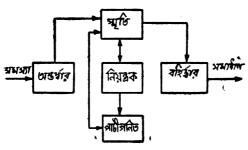
১নং চিত্র—কম্পিউটারের কর্মধারা

এখানে বলে রাখি, আমাদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে, একটি দ্বিসংখ্যক ভাষা (—আপনাদের দেশে আমাদের সংখ্যা আর একটু বাড়লে একটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য আমরা দাবী করব কিনা, তাই ভাবছি)। আমরা যখন কাজ করি, মানুষের সমস্যাকে আমাদের ভাষায় এবং আমাদের সমাধানকে মানুষের ভাষায় অনুবাদ করে দিতে হয়। আমাদের ভাষায় সব কিছুকেই দু'টি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ঐ দু'টি সংখ্যা হল ০ ও ১। যে-কোন সংখ্যার এক একটি ডিজিট (Digit) বা অঙ্ক হচ্ছে ঐ দু'টির মধ্যে একটি—০ বা ১। এই অঙ্ক দু'টি সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে ইংরেজিতে একে বলা হয় 'বাইনারি ডিজিট' (Binary digit), সংক্ষেপে 'বিট' (Bit)। আমাদের দ্বিসংখ্যক ভাষায় কোন সংখ্যাকে লিখতে দ্বিগুণোত্তর প্রণালী ব্যবহৃত

হয়। আপনাদের দশগুণোত্তরা প্রণালীতে যখন আপনারা লেখেন ২০৪৫, তখন আপনারা বোঝান $৫ \times ১০^{০} + ৪ \times ১০^{১} + ০ \times ১০^{২} + ২ \times ১০^{৩}$। আমাদের ভাষায় যখন আমরা লিখি ১০১১, তখন আমরা বোঝাই $১ \times ২^{০} + ১ \times ২^{১} + ০ \times ২^{২} + ১ \times ২^{৩}$।

বিট ব্যবহার করে শুধু যে সংখ্যাকে এবং + বা − চিহ্নকে প্রকাশ করা হয়, তা নয়, বিট আমাদের যুক্তিশক্তিরও ভিত্তি। হাঁ, নির্ভুল বা সত্য বোঝাতে হলে আমরা বলি ১ আর না, ভুল বা মিথ্যা বোঝাতে হলে ০। এই প্রতীকধর্মী যুক্তিধারার প্রবর্তক হলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের গণিতজ্ঞ জর্জ বুল। ১৯৩৮ সালে বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সার্কিটের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন অ্যামেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌স্টিট্যুট অব টেক্‌নোলজির তদানীন্তন স্নাতকোত্তর ছাত্র ক্লড শ্যানন। এই প্রয়োগের একেবারে মূল বক্তব্য হল: কোন সুইচ বন্ধ থাকলে তা দিয়ে বোঝানো হয় ১, আর খোলা থাকলে ০। শ্যানন এবং কালিন ও বুর্খার্টের কথা আগে আপনাদের বলেছি। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কালিন-বুর্খার্ট যন্ত্রে যুক্তিশক্তির প্রথম আবির্ভাব ঘটলো।

আমাদের দিয়ে কাজ করাতে হলে মানুষকে প্রথমে তার সমস্যা অনুযায়ী আমাদের জন্যে একটি কর্মসূচী স্থির করতে হয়। এই 'প্রোগ্রামিং' বা কর্মসূচী নির্ধারণে অনেক সময় যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। যে যে কাজ আমাদের করতে হবে, কর্মসূচীতে সেগুলির নির্দেশ দেওয়া থাকে। অ্যাবাকাস বা সাধারণ ডেস্ক ক্যাল্‌কুলেটরের সঙ্গে আমার মত ইলেকট্রনিক কম্পিউটারদের একটি প্রধান পার্থক্য হল—আমরা আমাদের মধ্যে প্রদত্ত কর্মসূচীকে সঞ্চিত করে রাখতে পারি, ফলে কোন কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ধাপগুলি আমরা নিজ থেকেই পরপর ক.‹ যেতে পারি। একটি উপমা দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একটি ছেলেকে দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে পোস্টার লিখিয়ে দেয়ালে সাঁটাতে হবে। আপনি তাকে নির্দেশ দিলেন—

"কয়েক খণ্ড কাগজ, এক বোতল কালি ও একটি তুলি যোগাড় করো, প্রত্যেকটা কাগজের উপর বড় বড় করে লেখো 'কম্পিউটার নিপাত যাক'। এইবার এক হাঁড়ি গঁদের আঠা যোগাড় করে পোস্টারগুলি নিয়ে রাত্রিবেলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো এবং যেখানে যত পরিষ্কার সুন্দর দেয়াল দেখতে পাবে, সেখানে আঠা দিয়ে পোস্টার ভাল করে সেঁটে দাও।" ছেলেটি ভাল কর্মী হলে আপনার সেই নির্দেশগুলি তার মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখবে এবং সেই অনুযায়ী কাজগুলি পরপর করে যাবে, কাজের প্রত্যেক ধাপে আপনাকে আর নির্দেশ দিতে হবে না। আপনি সকালে রাস্তায় বেরিয়ে দেখবেন, কম্পিউটারদের নিপাত কামনা করে পাড়ার সুন্দর দেয়ালগুলির সৌন্দর্য নিপাত গেছে। ঐ ছেলেটির মত আমরাও আমাদের করণীয় কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশ আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত করে রেখে সেই অনুযায়ী কাজ করে থাকি।

আমাদের পাঁচটি অঙ্গের এইবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি। প্রচ্ছিন্ন কার্ড, কাগজের ফিতা বা চৌম্বক ফিতায় নির্দিষ্ট কর্মসূচীকে দ্বিসংখ্যক ভাষায় লিখে আমাদের অন্তর্দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত করলে ঐ অঙ্গ তাকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে স্মৃতিতে পাঠিয়ে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মসূচী রচনা করা হয় সাংকেতিক ভাষায়। তখন আমাদের ভাষায় অনুবাদের কাজটি অন্তর্দ্বারেই ঘটে থাকে।

স্মৃতি অঙ্গের উপকরণ নানারকম হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে চৌম্বক ফিতার উল্লেখ করা যায়; টেপ-রেকর্ডারে আপনারা ঐ ধরনের ফিতার ব্যবহার দেখেছেন। এই ফিতায় থাকে ফেরাইট নামক একজাতীয় দ্রব্যের ছোট ছোট সব উপাদান। যে সব বাইনারি ডিজিট বা বিটকে স্মরণ করে রাখতে হবে, তাদের সমধর্মী বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে ঐ সব উপাদানের এক একটির চৌম্বক অবস্থা এক একটি বিট অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং সেই সব উপাদানের চৌম্বক অবস্থার মধ্যে বিটগুলির খবর জমা থাকে। কোন বিটকে স্মরণ করবার অর্থ: চৌম্বক

ফিতার যে উপাদানে ঐ বিটের খবরটি আছে, বিটটির তথাকথিত ঠিকানায় সেই উপাদানকে খুঁজে বের করা এবং উপাদানটির চৌম্বক অবস্থা অনুযায়ী একটি কার্যকর বৈদ্যুতিক সংকেতের সৃষ্টি করা। আমাদের স্মৃতি অঙ্গে যতগুলি বিট সঞ্চিত থাকতে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা ১০০ কোটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্মৃতি অঙ্গে একই আয়তনে যাতে সঞ্চিত বিটের সংখ্যা বাড়ানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে স্মৃতিতে খবর লিখে রাখা ও স্মৃতি থেকে খবর উদ্ধার করবার ব্যাপারে লেসার রশ্মি ব্যবহার করবার চেষ্টা চলেছে। ডাক টিকিটের আকারের একটি পাতলা ফিল্মের উপর লেসার রশ্মি দিয়ে লক্ষ লক্ষ বিট লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়।

নিয়ন্ত্রক অঙ্গকে আমাদের 'ব্যাণ্ডমাস্টার' বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি সুশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করবার দায়িত্ব এই অঙ্গের। 'কাজ আরম্ভ করো', 'যোগ করো', 'অমুক নং বিটকে স্মরণ করো', 'কাজ বন্ধ করো', প্রভৃতি যে সব নির্দেশ কর্মসূচীতে দেওয়া থাকে, সেগুলিকে এ বুঝতে পারে এবং এরই নির্দেশে আমাদের সমস্ত সুইচ যথাসময়ে খোলে বা বন্ধ হয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি দ্রুত-স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক দোলক বা ঘড়ি এবং রিলে (Relay), ডিলে (Delay) প্রভৃতি হরেক রকম বৈদ্যুতিক উপকরণ এ ব্যবহার করে থাকে।

ইলেকট্রনিক সুইচের সাহায্যে আঙ্কিক সব প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে পাটীগণিত অঙ্গ। এই সব সুইচ প্রায় আলোর সমান গতিতে খোলে বা বন্ধ হয়; এই সুইচগুলি খুলতে বা বন্ধ হতে সময় লাগে এক সেকেণ্ডের ১০০ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ। পাটীগণিত অঙ্গে মূলতঃ যে প্রক্রিয়াটি হয়ে থাকে, তা হল যোগ; তবে প্রতীকধর্মী যুক্তিধারার উপর ভিত্তি করে বিপুল সংখ্যক সুইচের সাহায্যে নানাবিধ প্রক্রিয়া এই অঙ্গটিতে সম্ভব হয়ে ওঠে।

যে সব ফলাফল স্মৃতিতে জমা হয়ে থাকে, নিয়ন্ত্রক অঙ্গের নির্দেশে সেই সব ফলাফল অনুযায়ী বৈদ্যুতিক সংকেত বহির্দ্বারে চলে যায় এবং সেখানে তারা রূপান্তরিত হয় এমনভাবে যাতে মানুষের বোধগম্য-রূপে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই আত্মপ্রকাশ প্রায়শঃ ঘটে প্রচ্ছিন্ন কার্ড বা কাগজের ফিতায় মুদ্রিত সাংকেতিক ভাষায়—যা থেকে সহজেই মানুষের প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করা চলে। কোন কোন কম্পিউটারের বহির্দ্বার থেকে ফলাফলগুলি কাগজের উপর মানুষের প্রচলিত ভাষাতেই মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই মুদ্রণের গতি এমন হতে পারে যে, এই পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা এক সেকেণ্ডেই মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসবে। তবে আমাদের কাজ করবার তুলনায় এই গতি অত্যন্ত ধীর হওয়ায় অন্য নানারকম মুদ্রণ ব্যবস্থার চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে। তাছাড়া, বহির্দ্বার অন্যান্য ভাবেও ফলাফল প্রকাশ করতে পারে। যেমন, বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় 'সেজ' (SAGE) নামক যে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়, তার বহির্দ্বার থেকে শত্রুপক্ষের বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ সোজাসুজি একটি বিশেষ পর্দার উপর উপস্থাপিত হতে পারে। অথবা এমন কম্পিউটারও আছে, যার এই অঙ্গটি মানুষের ভাষায় বিমান-চালককে সোজাসুজি নির্দেশ দেয় কোন্ পথে সে তার বিমানকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনবে।

যা হোক, আমাদের কাজের ধারা থেকে বুঝতে পারছেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের প্রভূত সাদৃশ্য আছে। মানুষের মতই আমরা অঙ্ক কষতে পারি, পারি স্মরণ করে রাখতে এবং যুক্তির আশ্রয় নিতে। অনেকে অবশ্য বলেন, ইনটিউয়িশন বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মানুষের যে যুক্তির ক্ষমতা, আমাদের তা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, উক্ত ইনটিউয়িশন হচ্ছে মানুষের অবচেতন মনের ধর্ম এবং অবচেতন মনের যুক্তি চেতন মনের যুক্তির মতই কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে ঘটে থাকে।

ঐ প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে এখনো প্রায় কিছুই জানা নেই; যখন জানা যাবে, তখন তাদের সমধর্মী প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরাও তথাকথিত ইনটুইশন-ভিত্তিক যুক্তিশক্তির অধিকারী হব।

অবশ্য মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্যও রয়েছে। যে সমস্যার সমাধান করতে একজন বিজ্ঞানীর কয়েক বছর কেটে যাবে, আমরা তা কয়েক ঘণ্টায় করে দিতে পারি। তবে এ কথা স্বীকার করবো যে, আমাদের স্মরণশক্তির তুলনায় মানুষের স্মরণশক্তি অনেক বেশি বিপুল: এক একটি কম্পিউটার ১০০ কোটি বিট পর্যন্ত স্মরণ করে রাখতে পারে বটে, কিন্তু একজন মাত্র মানুষের মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ১০০ কোটি কম্পিউটারের সম্মিলিত স্মৃতিশক্তিরও প্রায় ২০০ গুণ। তাছাড়া, আমাদের সুইচের সংখ্যা যেখানে ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ, সেখানে আপনাদের মস্তিষ্কে তার সমধর্মী নিউরনের সংখ্যা ১০০০ কোটি হওয়ায় আপনাদের মস্তিষ্ক যত হরেক রকম সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে, আমরা তা পারি না—সে দিক থেকে আমাদের গণ্ডী বেশ খানিকটা সঙ্কীর্ণ। এ কথাও স্বীকার করবো যে, কেবল অঙ্ক কষা ও যুক্তির আশ্রয় নেওয়াই মানুষের মস্তিষ্কের কাজ নয়, ভাবাবেগ, কল্পনা ইত্যাদিরও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আমাদের ক্ষমতা সেদিক থেকে অনেকখানি সীমিত। সব দিক বিবেচনা করে আমার কম্পিউটার-বুদ্ধিতে মনে হয়, মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্তে আমাদের ব্যবহারের কথা না ভেবে তার পরিপূরক হিসেবে আমাদের ব্যবহারের কথা ভাবাই যুক্তিযুক্ত। আপনাদের বুদ্ধিও কি তাই বলে না?

মানুষকে আমরা কত ভাবে সাহায্য করছি

কিছুদিন আগে পর্যন্তও যে সব সমস্যাকে বিজ্ঞানীরা অসাধ্য বলে মনে করতেন, আমাদের সাহায্যে তাদের অনেকগুলির সমাধান করা এখন সম্ভব হচ্ছে। একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, অন্যদিকে

তেমন শিল্প, ব্যবসায়, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োগ হচ্ছে। কেবল উন্নত দেশগুলিতে নয়, উন্নয়নশীল সব দেশেও আমাদের প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রসঙ্গতঃ বলতে পারি, ভারতবর্ষে বর্তমানে ২৫৪টি কম্পিউটার কার্যকর আছে। তাদের মধ্যে ১০০টি তৈরি করেছে ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান; বাকিগুলি অ্যামেরিকার আই বি এম কোম্পানীর তৈরি।

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার আজ সব চেয়ে চমকপ্রদ প্রয়োগ যে মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রেও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছি। গতিশীল মহাকাশযানের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলে আমরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিসেব-নিকেশ করে জানিয়ে দিই, ঐ যানটি পূর্বনির্ধারিত পথেই চলেছে কি না। যদি বিচ্যুতি ঘটে, তার পরিমাণও আমরা জানিয়ে দিয়ে থাকি। ঐ বিচ্যুতির মাত্রা খুব বেশি না হলে তাকে সংশোধন করবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে।

শিল্পক্ষেত্রে যে অটোমেশন (Automation) বা স্বয়ংক্রিয়তা যুগান্তর এনেছে, তার প্রধান কর্ণধার আমরা। ধাতুশিল্প, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় কাজ বা প্রক্রিয়াকে আমরা নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ঐ কাজ বা প্রক্রিয়ার রূপায়ণে কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা, তা আমরা পরীক্ষা করে দেখি। যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তা আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করবার ব্যবস্থা করে দিই। আমাদের কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী একেবারে গোড়ায় তৈরি করে দেওয়া ছাড়া এই কর্মধারায় মানুষের হস্তক্ষেপের আর কোন দরকার থাকে না। আমাদের ব্যবহার করে শিল্পে এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে যে, আজকাল অনেক সময় আমাদের উপর ভিত্তি করে নতুন শিল্পপদ্ধতির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

কারিগরী বিদ্যার বহু ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারদের সহকারী হয়ে আমরা

কাজ করে থাকি। ধরুন, কোন সেতু (বা বহুতল বাড়ি) তৈরি হবে অথবা কোন সুড়ঙ্গ কাটতে হবে ; তার জন্যে প্রয়োজনীয় যে সব গণনা, আমরা তা অত্যন্ত অল্প সময়েই সম্পন্ন করে দিই। কোন কোন ক্ষেত্রে এতে ব্যয়ও যথেষ্ট কমে যায়। একটা ঘটনার কথা বলি। কয়েক বছর আগে অ্যামেরিকার বোস্টন সহরে একটি ৩৪-তলা বাড়ির নক্সা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একজন স্ট্রাক্‌চারাল ইঞ্জিনীয়ারকে। সেই ইঞ্জিনীয়ারের মনে হল, প্রচলিত রীতির পরিবর্তে এক নতুন পদ্ধতিতে তিনি যদি নক্সা তৈরি করেন, তবে মাল-মসলা অনেক কম লাগবে এবং খরচও প্রচুর কম হবে। কিন্তু এজন্যে যে বিশদ ও জটিল হিসেব-নিকেশের দরকার, তা একমাত্র কম্পিউটারের মাধ্যমেই করা সম্ভব। কম্পিউটারের কর্মসূচী রচনায় অভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে তিনি কাজটির জন্যে নিযুক্ত করলেন। এইভাবে নতুন পদ্ধতির ভিত্তিতে যে বাড়ি তৈরি হল, তাতে অন্যান্য জিনিষের মধ্যে ইস্পাত কম লেগেছিল ১০০ টন। বাড়ি তৈরির মোট ব্যয় প্রায় ২ লক্ষ ডলার কমে গেল।

জানেন বোধহয়, অঙ্কনকে বলা হয় ইঞ্জিনীয়ারদের ভাষা। আলোক-ধারারূপ একটি কলমের সাহায্যে টেলিভিসনের পর্দায় ইঞ্জিনীয়ারদের নক্সাকে যদি অঙ্কিত করা যায়, তাহলে তাঁদের ভাষাকে সোজাসুজি আমাদের অন্তর্দ্বারের মাধ্যমে আমাদের ভাষায় আমরা অনুবাদ করে নিতে পারি এবং তারপর বলে দিতে পারি বিভিন্ন নক্সার মধ্যে কোন্‌টি সব থেকে উপযোগী।

শুধু ইঞ্জিনীয়ারদের নয়, চিকিৎসকদেরও আমরা সাহায্য করি। সোভিয়েত ইউনিয়নে সেজন্যে চিকিৎসাবিদ্যার সব চেয়ে মেধাবী ছাত্রদের আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। রোগের উপসর্গগুলি আমাদের কাছে উপস্থিত করলে আমরা সহজেই রোগ নির্ণয় করে দিতে পারি। তাছাড়া, মানুষের মস্তিষ্কের কর্মধারার সঙ্গে আমাদের কর্মধারার অনেক সাদৃশ্য থাকায় আমাদের কাছ থেকে

সংগৃহীত জ্ঞান নিয়ে মানুষ চেষ্টা করছে তার মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডের জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করতে, উদ্ভাবন করতে নানাবিধ স্নায়ুরোগের চিকিৎসার উপায়। এর উপর ভিত্তি করে নতুন যে বিষয়বস্তুটি গড়ে উঠেছে, তার নাম বায়োনিক্স্ (Bionics: Biology + Electronics)।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার অন্য ভাবে আমরা কাজ করে থাকি। ছাত্রদের কাছে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলে ধরা হয়, সেই সব প্রশ্নের উত্তর কি হবে ও কেন হবে, আমরা তা তাদের বলে দিই। এইভাবে তারা তাদের শিক্ষণীয় বিষয় ভাল ভাবে শিখে নিতে পারে। তাছাড়া, অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে আমরা শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে থাকি। সে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে—পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা তাকে তথ্য সরবরাহ করি। যেমন ধরুন, কোন বিশেষ বিষয়ে কোন্ কোন্ লেখকের কী কী বই আছে, আমরা তা নিমেষের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারি।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক নানান ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োগ হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীতে অসংখ্য তথ্য সঞ্চয় করে রাখতে হয় ও দীর্ঘ হিসেব-নিকেশের পালা থাকে; ঐ কাজগুলি অনেক ক্ষেত্রে আমরাই আজকাল করে দিচ্ছি। ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় ইত্যাদিতে আজ যে অটোমেসন বা স্বয়ংক্রিয়তা আশ্চর্যরকম সাফল্য লাভ করছে, তার অন্যতম কারণ আমাদের অকৃপণ সাহায্য। এখানে অটোমেশনের প্রধান অঙ্গ যে 'স্বয়ংক্রিয় তথ্যসংক্রান্ত কার্য-নির্বাহ' (Automatic Data Processing, সংক্ষেপে A. D. P.), সেটির দায়িত্ব আমরাই পালন করি। বিভিন্ন তথ্য আমাদের সরবরাহ করা হলে আমরা সেগুলি সঞ্চয় করে রাখি এবং সেগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করে বাঞ্ছিত ফলাফল জানিয়ে দিই বা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে থাকি। কোন ব্যবসায়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য পন্থার মধ্যে কোন্‌টি সব চেয়ে উপযোগী, প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাও আমরা বলে দিতে পারি।

খেলাধূলার আসরেও আজকাল আমাদের ডাক পড়ছে। কোন বড় প্রতিযোগিতায় যখন অনেকগুলি খেলা বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে চলতে থাকে, তখন সবগুলির খবর সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তিকে এবং সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিসনে তাৎক্ষণিক তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতে পারি, সোভিয়েত ইউনিয়নে মিল্‌স্ক-৩২ নামে আমাদের যে জ্ঞাতি-ভাই আছে, আন্তর্জাতিক জিমন্যাসটিক্স ও স্কেটিং প্রতিযোগিতায় সে এই ধরনের কাজ করেছে। তার উন্নত সংস্করণ ব্যবহার করে গড়ে তোলা হচ্ছে 'স্বয়ংক্রিয় তথ্য পরিচালনা ব্যবস্থা' (Automated data management system)—১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিকের সময় এই ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। অলিম্পিকের সামগ্রিক সংগঠনে এই ব্যবস্থা সহায়ক হবে।

এ সব ছাড়াও আমরা বিভিন্ন ভাবে মানুষকে সাহায্য করছি। যেমন ধরুন, বিমানে আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে কয়েকটি দেশে আমাদের প্রভূত প্রয়োগ হচ্ছে। যে-কোন সময়ে আসন সংরক্ষণ-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আমাদের কাছে জমা থাকে। কোন্ গাড়িতে কতগুলি আসন খালি আছে, আমরা তা দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে থাকি।

আবার ধরুন, আমাদের মধ্যে এমনো কম্পিউটার আছে, যে জাল স্বাক্ষর ধরে ফেলতে পারে। যাঁদের স্বাক্ষর পরে মেলাতে হতে পারে, তাঁরা যখন ঐ কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ইলেকট্রনিক কলম দিয়ে স্বাক্ষর করেন, তখন তাঁদের হাতের আঙুলের গতি ও চাপ অনুযায়ী উৎপন্ন সংকেত কম্পিউটারের স্মৃতিতে গিয়ে সঞ্চিত হয়। পরে যদি তাঁদের কারোর স্বাক্ষর মেলাতে হয়, তাঁকে বলা হবে ইলেকট্রনিক কলম দিয়ে স্বাক্ষর করতে; তখন যে সংকেত তৈরি হল, তাকে আগেকার সঞ্চিত সংকেতের সঙ্গে তুলনা করে দেখা হবে। যদি কেউ জাল স্বাক্ষর করে, কম্পিউটার এইভাবে তা ধরে ফেলবে এবং

তার পর্দায় ফুটে উঠবে একটি শব্দ : FORGERY অর্থাৎ জালিয়াতি (আর্ট প্লেটে ৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আগে যে মিনি-কম্পিউটারের কথা আপনাদের বলেছি, তারা দামে সস্তা এবং খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে। তারা আবার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যও বটে। এজন্যে উন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে দোকান, অফিস ইত্যাদিতে মিনি-কম্পিউটারের প্রচলন ব্যাপক হচ্ছে। বাড়ির কাজকর্মেও এরা সাহায্য করছে—যেমন, তাড়াতাড়ি হিসেব-নিকেশ করে দিচ্ছে, সহায়তা করছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে।

যাহোক, আমার মনে হয়, আমাদের সব থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের চেষ্টা চলেছে, তা হল একটি কম্পিউটারকে দিয়ে অন্য কম্পিউটার বানানো। জীবের অন্যতম লক্ষণ যে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা, আমরা তাহলে সেই ক্ষমতার অধিকারী হব। আমরা যে দিন জীব হিসেবে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করব, সেই 'দিন আগত ঐ'।

উপসংহার

বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করি বলে আজ আমাদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ, প্রথম শিল্পবিপ্লবের সময় সেই রকম একই কারণে যন্ত্রের বিরুদ্ধে ইওরোপে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, কিন্তু যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠল। যে আন্দোলন পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল যন্ত্রের মুনাফালোভী মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তা যন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিত হওয়ায় সে আন্দোলন অচিরেই 'কালস্রোতে ভেসে' গেল। আজ দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের আমরা সূচনা করেছি। ভবিষ্যতের প্রতীক আমরা, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আমাদের জয় হবেই। বিজ্ঞানীরা আমাদের জন্ম দিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্যে। জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা আমাদের দমন করবার 'ব্যর্থ পরিহাসে' যোগ দেন না, বরং চেষ্টা করেন যাতে আমাদের উন্নতি হয় ও মানুষের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত হয়ে যাতে আমরা সার্থক হয়ে উঠি।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মানুষের বুদ্ধি এক বিরাট শক্তি। তবে তা সুবুদ্ধি হতে পারে, কুবুদ্ধিও হতে পারে। আপনাদের দেশে যেহেতু কুবুদ্ধিরই চলন বেশি, সেজন্যে বুদ্ধিকেই বাতিল করতে হবে, এটা নিশ্চয় কাজের কথা নয়। বরং চেষ্টা করতে হবে বুদ্ধিকে আরো উন্নত করবার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সুপথে চালিত করবার।

এ কথা ঠিক যে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মুনাফা লাভের উপর ভিত্তি করে যদি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো রচিত হয়, তাহলে আমাদের প্রয়োগেরও মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ঐ মুনাফার বৃদ্ধি। কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি যদি হয় সর্বসাধারণের কল্যাণ, তাহলে আমাদের প্রয়োগে বেকারত্বের সৃষ্টি হবে না, কারণ যে সব কর্মী বাড়তি হিসেবে গণ্য হবেন, অন্যত্র তাঁদের নিয়োগ করবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করে দেবে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ বাহ্যতঃ আংশিকভাবে সত্য মনে হলেও মূলগত-ভাবে তা ভিত্তিহীন। বরং আপনাদের বিরুদ্ধে যদি এই অভিযোগ আনি যে, বিজ্ঞানের আজ যে উন্নতি হয়েছে, তার উপযোগী অর্থনৈতিক কাঠামো আপনারা এখনো গড়ে তুলতে পারেননি এবং সেজন্যে আমাদের অপব্যবহার ঘটছে ও আমাদের দুর্নাম রটছে, তবে সে অভিযোগ কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন?

ছাপা সার্কিট

কাগজের উপর ছাপা অক্ষর তো আপনারা হামেশাই দেখেছেন (—এখনো তা দেখছেন), আর ছাপা কাপড়ের সার্ট বা ছাপা শাড়ির সঙ্গে আপনাদের অনেকেরই নিশ্চয় ভাল রকম পরিচয় আছে। কিন্তু ছাপা সার্কিটের (Printed circuit) বিষয়টি হয়তো আপনাদের কারো কারো কাছে কিছুটা নতুন। ঐ সার্কিট সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রচলিত সার্কিট বনাম ছাপা সার্কিট

আধুনিক যুগে প্রগতির অন্যতম বাহক যে ইলেকট্রনিক্স, সেই ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপক ও সূক্ষ্ম ব্যবহারে ছাপা সার্কিটের অবদান অনেকখানি। রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউটার প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ভিতর রোধক (Resistor), আবেশক (Inductor), ধারক (Capacitor), ভাল্‌ব্‌ (ভ্যাকুয়ম টিউব) বা ট্রানজিস্টর, ট্র্যান্সফর্মার প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে ধাতব তারের ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। এই সব উপাদান এবং সংযোগকারী তার দিয়ে গড়ে ওঠে ইলেকট্রনিক সার্কিট, যার ভিতরের বিদ্যুৎপ্রবাহ ঈপ্সিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঐ সার্কিটে প্রত্যেকটি তারের প্রান্তকে আলাদা আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট উপাদানের প্রান্তের সঙ্গে সযত্নে ঝালাই (Solder) করে লাগিয়ে দিতে হয়। যে-কোন জটিল সার্কিটে বহুসংখ্যক তার ব্যবহার করতে হয় বলে সেই সার্কিট তৈরি করতে প্রচুর সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয় এবং যন্ত্রের মধ্যে ঐ সার্কিটের জন্যে জায়গাও লেগে যায় অনেকখানি।

সব চেয়ে অসুবিধা হল, এই ধরনের সার্কিট স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্যে ছাপা সার্কিটের উদ্ভাবন হয়েছে। ঐ সার্কিটে প্লাষ্টিক বা সিরামিক জাতীয় অপরিবাহী পদার্থের একখানি বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলা ধাতব পাত মুদ্রিত করে সেই সব পাত দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ করানো হয়; অর্থাৎ পাতগুলি ধাতব তারের কাজ করে। এই পাত এক ইঞ্চির কয়েক শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু হয়। প্রত্যেকটি পাতের প্রান্তে নির্দিষ্ট উপাদান জুড়ে দিয়ে ডোবানো ঝালাই (Dip soldering) প্রক্রিয়ায় সমস্ত ঝালাইয়ের কাজ একসঙ্গে করবার ব্যবস্থা থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে রোধক, আবেশক, ধারক প্রভৃতি কয়েকটি উপাদান পৃথকভাবে সংগ্রহ না করে বোর্ডটির উপর নির্দিষ্ট স্থানে ঐ সব উপাদান তৈরি করা হয় উপযুক্ত কোন পদার্থের পাতলা পাত বা অপরিবাহী বোর্ডের অংশবিশেষকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে।

ছাপবার জন্যে যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বোর্ডের উপর পাতলা পাত তৈরি করবার কাজে তাদের বেশ কয়েকটির সাহায্য নেওয়া হয়। ঐ বোর্ডটি দেখে মনে হয়, পাতগুলি যেন তার উপর মুদ্রিত করা হয়েছে। ছাপবার কাজে যেমন কাগজ বা কাপড়ের উপর হুবহু একই নক্সা অনেকগুলি আঁকা যেতে পারে, এক্ষেত্রেও তেমনি বোর্ডের উপর একেবারে একই ধাঁচে পাতলা পাতের অনেকগুলি নক্সা তৈরি করা সম্ভব হয়। এই সব কারণে পাতলা পাত সমেত বোর্ডকে ছাপা বোর্ড বলা যেতে পারে এবং ঐ বোর্ড ব্যবহার করে যে ইলেক-ট্রনিক সার্কিট তৈরি হয়, তাকে বলা যেতে পারে ছাপা সার্কিট। তবে সাধারণতঃ ছাপা বোর্ডকেই ছাপা সার্কিট নামে অভিহিত করা হয়।

ইতিবৃত্ত

ছাপা সার্কিট সম্পর্কে ধারণা খুব নতুন কিছু নয়। ১৯০৩ সালে

বৃটেনে এই বিষয়ে একটি পেটেন্ট গৃহীত হয়। তারপর মাঝে মাঝে এ নিয়ে বেশ কিছুটা গবেষণা হয়েছে। তবে ছাপা সার্কিটের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মর্টারের গোলা বিস্ফোরণের ব্যাপারে। এই বিস্ফোরণের ব্যাপারে একটা অসুবিধা ছিল যে, বিমান বা উড়ন্ত বোমার মত কোন লক্ষ্য বস্তুর যথেষ্ট কাছে পৌঁছনোর একটু আগে বা পরে যদি ফিউজ জ্বলে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটতো, তবে তাতে লক্ষ্য বস্তুর কোন ক্ষতি হত না। সেজন্যে বৃটেন ও অ্যামেরিকায় নৈকট্য ফিউজ (Proximity fuse) নামে এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিষয় পরিকল্পনা করা হল, যা মর্টারের গোলার অগ্রভাগে বসিয়ে দিলে লক্ষ্য বস্তু থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গোলাটি আপনা থেকেই বিস্ফোরিত হবে। বৃটেনে এই যন্ত্রের ডাক নাম ছিল বন্‌জো (Bonzo)। বেতার তরঙ্গের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রেরক ও গ্রাহক ব্যবস্থা নিয়ে এই যন্ত্রটি গঠিত। গোলা নিক্ষিপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরক ব্যবস্থা থেকে ক্ষুদ্র অ্যান্টেনার মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ নির্গত হবে। লক্ষ্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে এলে বেতার তরঙ্গ গৃহীত হবে গ্রাহক যন্ত্রে। যখন গোলাটি লক্ষ্য বস্তুর যথেষ্ট কাছে আসবে, তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের তীব্রতা এমন হবে যে, তা গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়া মাত্র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় গোলাটির বিস্ফোরণ ঘটবে।

নৈকট্য ফিউজ তৈরি করবার সমস্যা হল—মর্টারের গোলার অগ্রভাগের যৎসামান্য স্থানে এটিকে ধরাতে হবে, একে যথেষ্ট মজবুত হতে হবে, যাতে মর্টারের গোলা ছোঁড়বার ধাক্কা সে সামলাতে পারে এবং এই ফিউজ তৈরি করবার পদ্ধতি এমন হতে হবে যে, বহুল ব্যবহারের জন্যে একই ধাঁচের যথেষ্ট সংখ্যক ফিউজ যাতে অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এই সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা হয় নৈকট্য ফিউজে ছাপা সার্কিট ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে ছাপা সার্কিটের বহুল প্রচলন

হয়েছে। আমাদের দেশেও এই সার্কিট তৈরি হচ্ছে এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদিতে এর ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

গঠন পদ্ধতি

ছাপা সার্কিট তৈরির জন্যে অপরিবাহী পদার্থের বোর্ডের উপর ধাতব পাত বসানোর যে তিনটি মূল পদ্ধতি আছে, সেগুলি এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে।
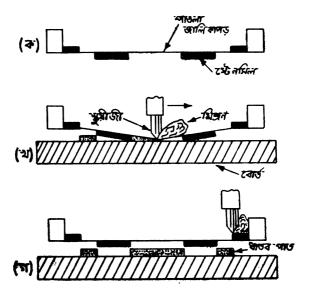
১নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের প্রথম পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম পদ্ধতিতে (১নং চিত্র) একটি পাতলা জালি কাপড়ের সঙ্গে ঈপ্সিত সার্কিটের নক্সা অনুযায়ী তৈরী স্টেন্‌সিল জোড়া থাকে এবং কাপড়টি টান করে বাঁধা থাকে একটি কাঠামোর সঙ্গে। উপযুক্ত কোন ধাতব পদার্থকে গুঁড়া করে ধুনা-সদৃশ এক ধরনের দ্রব্যের সঙ্গে মেশানো হয় ও সেই মিশ্রণকে স্কুয়ীজী নামক পেষকের সাহায্যে স্টেন্‌সিলের ফাঁকা

স্থানগুলির মধ্য দিয়ে অপরিবাহী বোর্ডের তলদেশের উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে অপরিবাহী তলদেশের উপর যে ধাতব পাতগুলি গড়ে ওঠে, সেগুলির বিন্যাস হয় ঈপ্সিত সার্কিটের নক্সা অনুসারে। নৈকট্য ফিউজের প্রস্তুতিতে এই পদ্ধতিটির সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয়েছিল। স্টিয়েটাইট নামক সিরামিক পদার্থের বোর্ডের সমতল পৃষ্ঠের উপর

২নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের দ্বিতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়
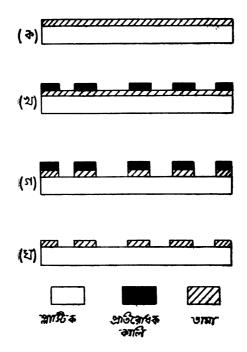
রূপার পাত দিয়ে ঐ সার্কিট তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই সার্কিটের রোধক ও ধারকগুলিও ছিল মুদ্রিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (২নং চিত্র) অপরিবাহী পদার্থের বোর্ডের একটি সম্পূর্ণ তলদেশের উপর ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়া হয়।

ছাপবার জন্যে যে সব সুপরিচিত প্রক্রিয়া আছে, সেগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ ধরনের প্রতিরোধক কালি (Ink resist) ঈপ্সিত নক্সা অনুযায়ী ধাতব আস্তরণের উপর মুদ্রিত করা হয়। অতঃপর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তলদেশটি চাঁচা হলে ঐ কালির প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে তার নিচের ধাতব আস্তরণ অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু বাকি অংশের আস্তরণ উঠে যায়। এর পর কালিটুকু তুলে ফেললে ছাপা সার্কিট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতিটিরই সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৪১ সালে ডক্টর পল আইজ্‌লার পদ্ধতিটির প্রবর্তন করেছিলেন।
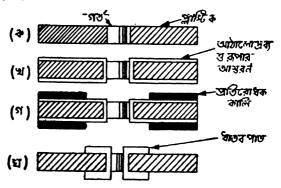
৩নং চিত্র—ছাপা সার্কিট গঠনের তৃতীয় পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়

তৃতীয় পদ্ধতিতে (৩নং চিত্র) বিদ্যুৎপ্রলেপণের সাহায্য নেওয়া হয়। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, বোর্ডের দু' পিঠের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগ করবার জন্যে যে সব গর্ত করা হয়, তলদেশের উপর ধাতব পাত লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গর্তগুলির ভিতরও পাত দিয়ে মোড়া হয়ে যায় এবং বোর্ডের দু' পিঠেই সাধারণতঃ ধাতব পাত বসানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে অপরিবাহী বোর্ডের উপর একটি আঠালো দ্রব্যের আস্তরণ দিয়ে তার উপর স্প্রে করে রূপার অতি সূক্ষ্ম (এক ইঞ্চির কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ) আবরণ দেওয়া হয়,

যাতে বিদ্যুৎপ্রলেপণের সময় ঐ রূপার মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হতে পারে। অতঃপর ঈপ্সিত সার্কিটের ধাতব পাতগুলির নক্সার বিপরীত ভাবে প্রতিরোধক কালি রূপার আবরণের উপর মুদ্রিত করা হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধাতব পাত থাকবে, সেখানে কালি মুদ্রিত হয় না। এইবার তামা প্রলেপণের উপযোগী কোন দ্রবণে বোর্ডটিকে ডুবিয়ে ঐ বোর্ডকে ক্যাথোডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। গর্তগুলির অভ্যন্তরভাগ সমেত যে সব অংশে প্রতিরোধক কালি নেই, সেই অংশ-গুলিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে তামা সঞ্চিত হয়ে ধাতব পাতের সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতির শেষ পর্যায়ে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বা যান্ত্রিক উপায়ে কালি ও রূপার আবরণ তুলে ফেলা হয়।

ছাপা সার্কিট তৈরির পর তাতে রোধক, ধারক প্রভৃতি উপাদান সংযোগের জন্যে ডোবানো ঝালাইয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই ডোবানো ঝালাই ব্যাপারটা কি? এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সংযোগস্থলে আলাদা আলাদাভাবে ঝালাই করতে হয় না, উপাদানগুলিকে বোর্ডের উপর যথাস্থানে বসিয়ে এবং বোর্ডটিকে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স লাগিয়ে সেটিকে গলিত ও উত্তপ্ত ঝালের (৬০ ভাগ টিন ও ৪০ ভাগ সীসা) মধ্যে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রাখলে সব ঝালাইয়ের কাজই একসঙ্গে হয়ে যায়। পরে কোন উপযুক্ত দ্রবণের সাহায্যে বা অন্য কোন ভাবে অতিরিক্ত ফ্লাক্স সরিয়ে ফেললে উপাদান সমেত ছাপা সার্কিট তৈরির কাজ শেষ হয়।

পরিশেষে বলতে হয় যে, ছাপা সার্কিটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্সে যে ক্ষুদ্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়তার সূত্রপাত হয়, নানাভাবে তা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট নামক যে অতি ক্ষুদ্র সার্কিটের উদ্ভব হয়েছে, ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে তা যুগান্তর নিয়ে এসেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

ইলেকট্রনিক্সের জগতে লিলিপুট

ক্ষুদে বামনদের দেশ লিলিপুটের গল্প আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি। সাম্প্রতিক কালে ইলেকট্রনিক্সের জগতে একটি লিলিপুট দেখা দিয়েছে, যার নাম মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স (Microelectronics)। এই লিলিপুটের বাসিন্দা লিলিপুটিয়ানদের বলা হয় 'মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট'। ইলেকট্রনিক্সের জগতে এদের আধিপত্য ক্রমশঃই বাড়ছে। এই লিলিপুটিয়ানরা না থাকলে মানুষের মহাকাশ অভিযান সম্ভব হত না। বছর বিশেক আগে এরা প্রধানতঃ কেবল মহাকাশ অভিযান ও আধুনিক রণসম্ভার নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কাজে নিযুক্ত ছিল, কারণ এদের দাম এত বেশি ছিল যে, অন্যান্য কাজে এদের খুব কমই ব্যবহার করা হত। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে এগুলিকে বিপুল সংখ্যায় তৈরি করা যাচ্ছে এবং এদের দাম আশ্চর্যরকম কমে গেছে। কি রকম কমেছে জানেন? ধরুন, একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি যদি ৫ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়, তাহলে দাম যে হারে কমে, অনেকটা সেই রকম।

ইলেকট্রনিক্সে ক্ষুদ্রীকরণ

ইলেকট্রনিক্সে ক্ষুদ্রীকরণ কার্যতঃ শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির আয়তন ও ওজন কম হলে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে ছাপা সার্কিটের উদ্ভব হয়েছিল, তার বিষয় পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব (Valve) নামক যে ভ্যাকুয়ম টিউবে অর্থাৎ বায়ুশূন্য নলে ইলেকট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক

ভোল্টেজের পরিবর্ধন ইত্যাদি সম্পন্ন হয়, সেই ভাল্‌বকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রাকৃতি করা হয়েছিল। রোধক (Resistor), ধারক (Capacitor) প্রভৃতি উপাদানকেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে তৈরি করা গেল। ফলে অবস্থা যা দাঁড়াল, তাতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রতি ঘন ফুটে প্রায় ৫,০০০ উপাদান ধরানো সম্ভব হল।

১৯৪৮ সালে ট্র্যানজিস্টর উদ্ভাবিত হওয়ার পর ইলেকট্রনিক্সে ক্ষুদ্রীকরণ প্রকাণ্ড এক ধাপ এগিয়ে গেল। ট্র্যানজিস্টর এবং ঐ রকম অন্যান্য আধা-পরিবাহী উপাদান বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভাল্‌বের স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করলো। ট্র্যানজিস্টর আকারে ভাল্‌বের চেয়ে অনেক ছোট। ট্র্যানজিস্টরের কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ (অর্থাৎ বিভব-পার্থক্য) ভাল্‌বের তুলনায় বহুলাংশে কম হওয়ায় বিদ্যুৎ-শক্তির উৎসের আকারও বহুলাংশে ছোট হল। ভাল্‌ব রেডিও সেটের চেয়ে ট্র্যানজিস্টর সেট সেজন্যে আয়তনে অনেক ছোট।

অতঃপর এল ইলেকট্রনিক্সে অতিক্ষুদ্রীকরণের (Microminiaturization) পালা। এই অতিক্ষুদ্রীকরণ নিম্নলিখিত তিন ভাবে হতে পারে:—

(১) পৃথক-উপাদান পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সব সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদানকে পৃথক পৃথক ভাবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রাকারে তৈরি করা হয়।

(২) পাতলা-পাত (Thin-film) পদ্ধতি—কাঁচ বা সিরামিকের মত কোন অপরিবাহী পদার্থের একটি অধঃস্তরের উপর ধাতু, আধা-পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের পাতলা পাতের আকার ও রাসায়নিক গঠন নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে দিয়ে বিভিন্ন উপাদানের কাজ করানো হয়। এই পাত এত পাতলা হয় যে, এরকম এক হাজার পাত উপর উপর রাখলে উচ্চতা হয় মাত্র এক মিলিমিটার।

(পাতলা পাত সার্কিটের পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরু-পাত (Thick-film) সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এতে পরিবাহী বা

অপরিবাহী পদার্থের কালির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত পুরু প্যাত তৈরি করে তাই দিয়ে বিভিন্ন উপাদানের কাজ করানো হয়ে থাকে।)

(৩) ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (Integrated circuit) পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড আধা-পরিবাহী পদার্থের বিভিন্ন অংশের ধর্মকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে, সেই খণ্ডটি বহু উপাদান সমন্বিত একটি সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সার্কিটের মতন কাজ করে। একে বলা হয় 'ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট', সংক্ষেপে আই সি (IC)।

কোন কোন ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলির একাধিক পদ্ধতিকে একসঙ্গে কাজে লাগানো হয়। এইভাবে গড়ে ওঠে সংকর (Hybrid) সার্কিট।

ইলেকট্রনিক্সে অতিক্ষুদ্রীকরণ কি পর্যায়ে পৌঁচেছে, তা বোঝা যাবে একটি উদাহরণ দিলে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরী হয়, সেটি ১৫০০ বর্গ ফুট জায়গা অধিকার করেছিল। এখন ঐ একই রকম সার্কিট সমন্বিত যন্ত্রের আয়তন এক টাকার একটি মুদ্রার আয়তনের সমান মাত্র।

ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট

বর্তমানে যে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্সের দ্রুত প্রসার হচ্ছে, তার অন্যতম কারণ হল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আই সি-এর ব্যাপক প্রয়োগ। আই সি যেমন আকারে ছোট, তেমনি দামে সস্তা। আবার কাজে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যও বটে।

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উপাদান মিলিয়ে মোট ক'টি উপাদানের কাজ করতে পারে একটি আই সি? ১৯৬০ সালে এই সংখ্যার সর্বোচ্চ মান ছিল প্রায় ৫০; এখন হয়েছে প্রায় ১০,০০০। এই রকম আই সি-কে বলা হয় 'লার্জ-স্কেল ইন্টিগ্রেসন' (Large-Scale Integration), সংক্ষেপে এল এস আই (LSI); 'লার্জ-স্কেল ইন্টিগ্রেসন'-এর অর্থ—বৃহৎ মাত্রায় সামগ্রিকীকরণ। সাম্প্রতিক কালে মাইক্রো-প্রসেসর

(Microprocessor) নামক যে সব অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক উপাদানের উৎপত্তির ফলে কম্পিউটার যন্ত্রের ক্ষুদ্রীকরণ বিরাট এক ধাপ এগিয়ে গেছে, সেগুলির প্রত্যেকটি বস্তুতঃ এক-একটি এল এস আই।

কয়েক বছর আগে আই সি-এর কর্মক্ষমতা অপেক্ষাকৃত নিম্ন কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন মাইক্রো-তরঙ্গের মত উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়েও এ কাজ করতে পারে।

আই সি প্রস্তুতিতে যে পদার্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে সিলিকন। পৃথিবীর বুকে এই পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে আছে—বালির অন্যতম উপাদান হল সিলিকন। আই সি প্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল এই রকম :—

গবেষণাগারে সিলিকনের কেলাস তৈরি করে তাই থেকে পাতলা পাতলা চাকতি কেটে নেওয়া হয়। এইগুলি সব বিশুদ্ধ সিলিকনের চাকতি। ঈপ্সিত নক্সা অনুযায়ী এক-একটি চাকতির উপর উপযুক্ত আবরণীর একই রকম নক্সা পাশাপাশি অনেকগুলি মুদ্রিত করা হয়। অতঃপর চাকতিগুলিকে একটি কোয়ার্টজ্ 'নৌকায়' বসিয়ে জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে রাখা হয়। যখন চুল্লীর ভিতর উষ্ণতা কয়েক হাজার ডিগ্রী সেল্‌সিয়াস, তখন নক্সার নিরাবরণ অংশগুলিতে রাসায়নিক অবিশুদ্ধি (Impurities) ঢুকিয়ে দেওয়ার এমন ব্যবস্থা থাকে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী নক্সাটির অংশবিশেষে ঋণাত্মক (negative) বা ধনাত্মক (positive) আধানের আধিক্য গড়ে ওঠে। এইভাবে তৈরী হয় এন-অঞ্চল (n-region) ও পি-অঞ্চল (p-region)। এইগুলির যথাযথ সমন্বয়েই প্রত্যেকটি নক্সা রূপান্তরিত হয় এক-একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে। (বস্তুতঃ আধা-পরিবাহী ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদিও তৈরী হয় এন-অঞ্চল ও পি-অঞ্চলের সঠিক সমন্বয়ের ফলে)।

অতঃপর চাকতিগুলিকে চুল্লীর বাইরে এনে প্রত্যেক চাকতির প্রতিটি একক বা তথাকথিত চিপ (Chip) সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়। যে দু' একটি চিপ ত্রুটিপূর্ণ থাকে, সেগুলিকে বাদ

দিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে এক-একটি চাকতি থেকে বহু চিপ একসঙ্গে উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রচলিত সার্কিটের তুলনায় আই সি তৈরির খরচ যে অনেক কম, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে একটা 'যদি' আছে। যদি অন্ততঃ ৫০,০০০ অবিকল একই রকম সার্কিট তৈরি করা হয়, তবে এই সার্কিট তৈরী করা লাভজনক। কারণ এই সার্কিট তৈরি করবার জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি কিনতে হয়, কম সংখ্যক সার্কিট তৈরি করলে তাদের খরচ পোষায় না।

আমাদের দেশে এখনো আই সি তৈরী হয় না, তবে বহু আই সি সমন্বিত সিলিকন চাকতি বিদেশ থেকে আমদানি করে এখানে ২-৩টি প্রতিষ্ঠানে সেগুলিকে কেটে পৃথক করা হচ্ছে এবং তারপর তাদের যথারীতি আবৃত করে ব্যবহারের উপযোগী করবার ব্যবস্থাও হয়েছে। আর্থিক দিক থেকে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, কেননা আই সি তৈরি করবার চার ভাগের তিন ভাগ খরচই হয় এই কাজে।

মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিটের ব্যবহার

মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহারের ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কত ক্ষুদ্রাকৃতি করে তৈরী হচ্ছে, আর্ট প্লেটের ৭নং চিত্রে তার একটি নমুনা দেখানো হয়েছে। ছবিতে টেবিলের উপর যে বড় পরিবর্ধক যন্ত্রটি (Amplifier) রয়েছে, মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে তৈরী তার ক্ষুদ্র সংস্করণটিকে হাতের তালুতে ধরা যায়। 'টানেল ডায়োড' নামক যে সক্রিয় উপাদান এতে ব্যবহৃত হয়, সেগুলির একটিকে দেখা যাচ্ছে ছবিটির ভিতরের অংশে—এটির আয়তন একটি ছোট পিঁপড়ার আয়তনের প্রায় সমান। এই ধরনের ক্ষুদ্র পরিবর্ধক যন্ত্র কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া টেলিভিসন, রেডার ইত্যাদিতে এর প্রয়োগ-সম্ভাবনা রয়েছে।

মহাকাশযানে রক্ষিত কম্পিউটার, ক্ষেপণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রভৃতিতে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিটের ব্যবহার হয়। মহাকাশযানে বহু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রাখতে হয়, অথচ 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী'—সেখানে কোন রকমে ঠাঁই করে নিতে হলে যন্ত্রপাতির আকার ছোট এবং ওজনও অল্প হওয়া দরকার। ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির ক্ষেত্রে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স এই চাহিদা মিটিয়েছে।

আই সি ব্যবহার করে যে মিনি-কম্পিউটার তৈরী হয়েছে, তা আকারে ছোট ও দামে সস্তা, কাজও করতে পারে বেশি তাড়াতাড়ি। তাদের মধ্য দিয়ে যখন বৈদ্যুতিক সংকেত যায়, তখন তার গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ কম, অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার। প্রচলিত বড় কম্পিউটারে এত তার ও বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয় যে, তার সম্পূর্ণ চলার পথে সময় লাগে প্রায় ১/১০ সেকেণ্ড। কম্পিউটার যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে, তাতে এই সময় মোটেই নগণ্য নয়। মিনি-কম্পিউটারে ব্যবহৃত তার ইত্যাদি অনেক কম হওয়ায় এই সময় অনেকখানি সংক্ষিপ্ত হয় এবং সেজন্যে এই কম্পিউটার একই কাজ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে করতে পারে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে এই কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা বেশি।

আই সি আশ্চর্য রকম স্বাস্থ্যের অধিকারী—এর বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এজন্যে মিনি-কম্পিউটার ইত্যাদি যে সব যন্ত্রে আই সি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

আই সি-এর প্রস্তুতি-প্রণালী ও সংখ্যাত্মক কম্পিউটারের নির্মাণ-কৌশলের যথাযথ সমন্বয়ের ফলে মাইক্রো-প্রসেসর নামক যে অতি ক্ষুদ্র উপাদান বা চিপ আজকাল তৈরী হচ্ছে, তাদের কয়েকটি মিলে প্রকাণ্ড কম্পিউটারের কাজ সাবলীল ভাবে করে দিতে পারে। এইভাবে মিনি-কম্পিউটারের আরো মিনি সংস্করণ দেখা দিয়েছে। নাম: মাইক্রো-কম্পিউটার। কয়েক হাজার ইলেকট্রনিক সার্কিটের কাজ

করে এক-একটি মাইক্রো-প্রসেসর বা চিপ, কিন্তু এই চিপ-এর আকার কত ছোট জানেন ?—দৈর্ঘ্যে ৫ মিলিমিটার, প্রস্থে ৫ মিলিমিটার ও উচ্চতায় ০'২৫ মিলিমিটার। এই রকম একটি মাত্র চিপ ব্যবহার করে যে-কোন বড় কারখানার যাবতীয় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করা সম্ভব। মাইক্রো-প্রসেসর ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের কেবল আকারই ছোট হয়নি, দামও কমে গেছে অনেকখানি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এই ধরনের কম্পিউটারের প্রয়োগ দ্রুত বেড়ে চলেছে।

রেডারের ক্ষেত্রেও মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিটের ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের সাধারণতঃ জানা আছে, রেডার হল প্রেরক, গ্রাহক, অ্যাণ্টেনা ইত্যাদি নিয়ে একটি বৃহৎ যান্ত্রিক ব্যবস্থা। কয়েক মাস আগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এমন একটি ক্ষুদ্র ও হাল্‌কা রেডার প্রদর্শিত হয়েছিল, যা একজন লোক অনায়াসে বহন করতে পারে। এই মিনি-রেডার দৈর্ঘ্যে ৩০ সেন্টিমিটার, প্রস্থে ২৬ সেন্টি-মিটার ও উচ্চতায় ১৫ সেন্টিমিটার। মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করে ঐ রেডার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এতে রয়েছে ১৩ রকমের ২২টি মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট। মিনি-রেডারের দৃষ্টিসীমার মধ্যে বিমানের মত কোন লক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হলে বাহকের কানে-লাগানো হেডফোনে উৎপন্ন শব্দের মাধ্যমে বাহক তার উপস্থিতি জানতে পারেন। রেডারের পর্দায় বস্তুটির দূরত্ব ও অবস্থান সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দিষ্ট হয়। এই ধরনের মিনি-যন্ত্র রেডার নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শেষ কোথায়, কি আছে শেষে ?

ইলেকট্রনিক্সে ক্ষুদ্রীকরণ যে হারে এগোচ্ছে, তাতে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, এর কি কোন শেষ আছে ? উত্তর হল—হ্যাঁ, এর একটি শেষ সীমা আছে। সেই সীমা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় দ্বারা মোটামুটিভাবে নির্ধারিত হয়—

(১) ইলেকট্রনিক সার্কিটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ গেলে তাপের সৃষ্টি হয়। যন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট আয়তনে সার্কিটের সংখ্যা খুব বেশি হলে উৎপন্ন তাপ যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্ক্রান্ত হয় না। ফলে উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে সার্কিটের ক্ষতি হতে পারে।

(২) যে যন্ত্র দিয়ে বা যে পদ্ধতিতে মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট তৈরী হয়, তার পক্ষে শতকরা ১০০ ভাগ নিখুঁত হওয়া সম্ভব নয়।

(৩) যদি আধা-পরিবাহী সার্কিট খুব ছোট হয়, তবে তার মধ্য দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মি যাওয়ার ফলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দু' একটি সার্কিট অকেজো হলে সমস্ত যন্ত্রই বিকল হয়।

(৪) আধা-পরিবাহী সার্কিটের যে-যে জায়গায় অবিশুদ্ধির ঘনত্ব সমান হওয়ার কথা, সেখানে বস্তুতঃ কিছু না কিছু তারতম্য থাকে। অতি ক্ষুদ্র সার্কিটের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে যতগুলি মাইক্রো-ইলেকট্রনিক সার্কিট গাঁটবদ্ধ হয়ে থাকে, সেগুলির মোট সংখ্যাকে বলা হয় গাঁইট-ঘনত্ব (Packaging density)। বর্তমানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ক্ষেত্রে এই ঘনত্ব প্রায় এক লক্ষ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মানুষের মস্তিষ্কে অনুরূপ বস্তুর ঘনত্ব প্রায় এক কোটি। আধা-পরিবাহী উপাদানের ক্ষেত্রে এই ঘনত্বের সর্বোচ্চ সীমা ১০ কোটি। অন্যান্য মাইক্রো-ইলেকট্রনিক উপাদানের ক্ষেত্রে এই সীমা হচ্ছে ১০০ কোটি।

চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্স

চিকিৎসা বলতে সাধারণতঃ যা আমাদের মনে আসে, তা হল শিশিভর্তি মিক্সচার বা ওষুধের বড়ি, যন্ত্রপাতির মধ্যে স্টেথিস্কোপ বা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ। আর ইলেকট্রনিক্স বলতে আমরা বুঝি রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউটার ইত্যাদি—যাতে ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব, ট্রান্‌জিস্টর বা ঐ জাতীয় সব উপাদান ব্যবহার করা হয়। তাহলে চিকিৎসার সঙ্গে ইলেকট্রনিক্সের সম্পর্ক কোথায় ?

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের একটা ব্যবহারের কথা অবশ্য আমরা অনেক দিন থেকেই জানি। দেহের কোন ভিতরের অংশের—যেমন, কোন হাড় বা ফুস্‌ফুসের ছবি তোলবার জন্যে যখন র‍্যাণ্ট্‌গেন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই রশ্মি উৎপাদনের জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে প্রধানতঃ যে কারণে সম্প্রতি চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্সের প্রভূত প্রয়োগ হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে মৃত ব্যাঙ নিয়ে এক ধরনের মজার পরীক্ষা।

গ্যাল্‌ভানির পরীক্ষা ও জৈব বিদ্যুৎ

সে প্রায় দু-শ' বছর আগেকার কথা। ইতালির লুইজি গ্যাল্‌ভানি এক মেঘলা দিনে একটি সদ্যমৃত ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তাই নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা দেখিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের একেবারে অবাক করে দিয়েছিলেন। বজ্রপাত থেকে তাঁর বাড়িকে রক্ষা করবার জন্যে বাড়ির ছাদে যে লোহদণ্ড খাড়া করা ছিল, তাতে একটা তার বেঁধে তিনি সেই তারের অন্য প্রান্ত বাঁধলেন মৃত ব্যাঙটির মাথার দিকে; আর একটি তার ব্যাঙের এক পায়ে বেঁধে সেই তারের অপর প্রান্ত

াখলেন তাঁর বাড়ির কূয়ার জলের ভিতর। এরপর যখনই াছাকাছি বজ্রপাত হচ্ছিল, তখন দেখা যাচ্ছিল—ব্যাঙের দেহটি াজোরে নড়েচড়ে উঠছে। অনেকেই একে ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে ›রলেন। কিন্তু গ্যালভানি আসল ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। বজ্রপাতের াময় বিদ্যুতের একটা অংশ ছাদের লৌহদণ্ডে ধরা পড়ছিল এবং ›খন ব্যাঙের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হচ্ছিল। মরা ব্যাঙকে াচানো যে বিদ্যুতেরই কারসাজি, তা গ্যাল্‌ভানি আন্দাজ করেছিলেন।

গ্যাল্‌ভানি এই ধরনের আরো পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষা থকে জানা যায় যে, বিদ্যুতের ক্রিয়ায় দেহের পেশী ও স্নায়ুতে গতির নঞ্চার হয়। তাই যদি হয়, তাহলে জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার ়ূলেও কি বিদ্যুৎ রয়েছে? ক্রমে জানা গেল, ধারণাটা ঠিকই—প্রাণীর বোধশক্তির কেন্দ্র যে মস্তিষ্ক, সেখানে সব খবর জানিয়ে দওয়া এবং সেখান থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে কাজ করবার আদেশ পাঁছে দেবার ব্যাপারে বিদ্যুৎপ্রবাহই দূতের কাজ করে। দেহের প্রত্যেকটি পেশী বা স্নায়ু হাজার হাজার জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের চারধারে একটি অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লীর (Membrane) আবরণ থাকে। দেহের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই সঙ্গে ঐ ঝিল্লির বিশেষ ধর্মের ফলে ঝিল্লীর ভিতরের ও বাইরের অংশের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব-পার্থক্যের উৎপত্তি হয়। এই বিভব-পার্থক্য থেকে কিভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ কেমন ভাবে দেহের মধ্যে কাজ করে, একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, শ্যামের পায়ে রাম একটা চিমটি কাটলো। শ্যামের পায়ের ঐ অংশের স্নায়ুকোষগুলির ভিতর ও বাইরের মধ্যে যে বিভব-পার্থক্য, তার তখন পরিবর্তন ঘটলো এবং সেজন্য বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হল। অতঃপর ঐ সব কোষের পার্শ্ববর্তী কোষগুলিরও ভিতর ও বাইরের বিভব-পার্থক্যের পরিবর্তন হয়ে সেগুলির মধ্য দিয়েও বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হল। এইভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত

মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল এবং তখনই কেবল চিমটির অনুভূতি শ্যামের বোধগম্য হল। অতঃপর শ্যামের মস্তিষ্ক যদি মনে করে যে, তার ডান হাত দিয়ে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে নিলে ভাল হয়, তাহলে বিদ্যুৎপ্রবাহ মারফৎ মস্তিষ্কের আদেশ গিয়ে পৌঁছবে ডান হাতের এমন সব স্নায়ুতে, যাদের সক্রিয়তায় ডান হাতটি পায়ে হাত বুলোতে থাকবে।

জৈব বিদ্যুৎ ও রোগ নির্ণয়

প্রাণিদেহে নিরন্তর হৃৎস্পন্দন হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচলের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনবরত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। কোন লোকের হাতের কব্জি বা পায়ের গোড়ালিতে ছোট ছোট ধাতব পাত রাখলে সেগুলি বিদ্যুদ্‌দ্বার হিসেবে কাজ করে এবং তাদের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুযায়ী সংকেত পাওয়া যায়। যে যন্ত্রে এই সংকেত লিপিবদ্ধ করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ (Electrocardiograph)। বিদ্যুদ্‌দ্বার থেকে পাওয়া সংকেত ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক পরিবর্ধকের (Amplifier) সাহায্যে পরিবর্ধিত করে সেই অপেক্ষাকৃত বড় মাপের সংকেত দ্বারা একটি বিশেষ কলমের গতি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আবার যন্ত্রটির এক বিশেষ ব্যবস্থায় একটি কাগজের বাণ্ডিল থেকে ক্রমাগতই কাগজ বেরিয়ে এসে ঐ কলমের মুখের ঠিক তলা দিয়ে সমান গতিতে সরে যেতে থাকে। এই ব্যবস্থায় ঐ কাগজের উপর যে চিত্র অঙ্কিত হতে থাকে, তা কলমের গতির উপর নির্ভর করে। আবার ঐ কলমের গতি নির্ভর করে বৈদ্যুতিক সংকেতের উপর—যে সংকেত উৎপন্ন হয়েছে হৃৎস্পন্দনজনিত বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুযায়ী। সুতরাং লেখচিত্রটি ঐ তরঙ্গের প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই চিত্রকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram)—সংক্ষেপে ই সি জি (ECG) বা ই কে জি (EKG)। হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকলে ই সি জি-এর

প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট ধরনের হয়। কোন হৃদ্‌রোগ থাকলে ই সি জি-এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ই সি জি দেখে চিকিৎসক বুঝতে পারেন, হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ আছে কি না। কোন রোগ থাকলে ই সি জি পরীক্ষা করে চিকিৎসক বহু ক্ষেত্রেই রোগটি নির্ণয় করতে পারেন।

আমাদের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph)। এই যন্ত্র থেকে যে লেখচিত্র পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম (Electroencephalogram)—সংক্ষেপে ই ই জি (EEG)। স্নায়বিক রোগ নির্ধারণে ই ই জি-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের পেশী, চক্ষু ও অক্ষিপটের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্যেও পৃথক পৃথক যন্ত্র নির্মিত হয়েছে।

ই সি জি বা ই ই জি-এর বিশদ পাঠোদ্ধারের জন্যে অনেক সময় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এই সব যন্ত্রাদি কখনো কখনো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন রোগ নির্ণয় করতে পারে, যা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও ধরা সম্ভব নয়। অ্যামেরিকায় একজন রোগীর ই সি জি বিশ্লেষণ করে একবার এমন রোগের কথা জানতে পারা গেছলো, যার আভাস রোগী নিজেও আগে কোন দিন পাননি।

নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ সম্পর্কিত সাইবারনেটিক্স (Cybernetics) নামক বিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি গড়ে উঠেছে, তা একদিকে যেমন কয়েক রকম আধুনিক যন্ত্র তৈরি করবার কাজে লাগে, অন্যদিকে তেমনি জীবদেহের কয়েকটি কর্মধারা বুঝতে ও সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে রোগ নির্ণয় করতে মানুষকে সাহায্য করে। বিজ্ঞানের এই শাখায় ইলেকট্র-নিক্সের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিভিন্ন সংকেতে ইলেকট্রনিক যন্ত্র কিভাবে সাড়া দেয়, তাই জেনে নিয়ে বিজ্ঞানীরা বুঝতে চেষ্টা করেন, নানান কারণে জীবদেহের মধ্যে উৎপন্ন বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সংকেতে দেহের কোন্‌ অংশে কী প্রতিক্রিয়া হয়। কোন রোগীর ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়ার বিকৃতি হলে তাই লক্ষ্য করে অনেক সময় রোগ নির্ণয় করা যায়।

রোগ নির্ণয়ে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার

রোগ নির্ণয়ের জন্যে কয়েকটি যন্ত্রপাতির কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নামে যে যন্ত্র আছে, তা আবার অন্য ভাবে চিকিৎসককে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। কোন্ রোগে কী কী উপসর্গ দেখা দেয়, সেই বিষয়ে যত তথ্য জানা আছে, সেগুলি আগে থেকেই কম্পিউটারে সঞ্চিত করা থাকে। কোন রোগীর ক্ষেত্রে সব উপসর্গ দেখে কম্পিউটারকে জানালে কম্পিউটার সেগুলিকে বিভিন্ন রোগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সঠিক রোগটি নির্ণয় করে জানিয়ে দেয়। এই রকম কম্পিউটারকে সেজন্যে 'ইলেকট্রনিক ডাক্তার' বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্যে বহু বইপত্র ঘেঁটে চিকিৎসককে যে সময় ব্যয় করতে হয়, ইলেকট্রনিক ডাক্তারের সহযোগিতা পেলে তার আর দরকার হয় না।

ফ্রাঁসোয়া পেইশা নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী একবার ইলেক-ট্রনিক ডাক্তারের সঙ্গে মানুষ-ডাক্তারের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন। চোখের কর্নিয়া (Cornea) বা অচ্ছোদপটলের নানারকম রোগের ৮০০টি লক্ষণ আগে ইলেকট্রনিক ডাক্তাররূপ কম্পিউটারকে জানিয়ে দিলে সেগুলি তার স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। তারপর জনৈক রোগীর ব্যাধিগ্রস্ত কর্নিয়া সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ কম্পিউটারকে জানানো হলে সে রোগের লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কয়েকটি সম্ভাব্য রোগের নাম উল্লেখ করলো। একজন চিকিৎসকও রোগীকে পরীক্ষা করে কতকগুলি সম্ভাব্য রোগের নাম বললেন। দেখা গেল, চিকিৎসক যে সব রোগের নাম বলেছেন, কম্পিউটার তো সেগুলি বলেইছে, উপরন্তু আরো ৪টি বিরল রোগের নাম জানিয়েছে, যাদের কথা চিকিৎসকের মনে পড়েনি। সুতরাং প্রতিযোগিতায় জয় হল কম্পিউটারের।

বিভিন্ন ব্যাধির ঘটনার যে বিশদ ইতিবৃত্ত (Case history) চিকিৎসকরা লিখে রাখেন, সেগুলি থেকে অর্জিত জ্ঞান বহু ক্ষেত্রে

রোগ নির্ণয়ে আলোকপাত করতে পারে। ইলেকট্রনিক ডাক্তার যাতে ঐ জ্ঞান লাভ করতে পারে, সেজন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা তার স্মৃতির সঙ্গে 'অভিজ্ঞতা' নামে একটি অংশ জুড়ে দিয়েছেন। এতে চিকিৎসকদের বহু অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ থাকে। এই অংশ ব্যবহারের ফলে ইলেকট্রনিক ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে যায়।

অ্যামেরিকায় এমন কম্পিউটার-ভিত্তিক তথ্য-কেন্দ্র রয়েছে, যার সংযোগ আছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে এবং যার মাধ্যমে সেই সব অঞ্চলের চিকিৎসকরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারেন।

অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স

আমাদের দেহের ভিতরের বিদ্যুৎতরঙ্গ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। যখন কোন গুরুতর অস্ত্রচিকিৎসা চলতে থাকে, তখন দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চিকিৎসকের সব সময়েই জানা দরকার। এই ব্যাপারে ইলেকট্রনিক্স তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের কথা বলি। হৃৎপিণ্ড উন্মুক্ত করে যখন অস্ত্রোপচার করা হয়, তখন রোগীর দেহের অবস্থা ক্রমাগত নির্ধারণ করবার জন্যে উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে রোগীর হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তের চাপ প্রভৃতি চব্বিশটি বিভিন্ন বিষয় একই সঙ্গে নির্ণয় করা হতে থাকে। টেপ-রেকর্ডারে যে টেপ বা ফিতা ব্যবহার করা হয়, সেই রকম ফিতায় ঐ সব তথ্য সঞ্চিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার মাধ্যমে কতকগুলি বোর্ডের উপর সেগুলি প্রদর্শিত হয়। চিকিৎসক ঐ বোর্ডগুলির দিকে একবার তাকিয়েই রোগীর দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক জানতে পারেন। প্রতি আধ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর বোর্ডের সংখ্যাগুলি পাল্টে যেতে থাকে। ফলে রোগীর অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন হয়, তা প্রায়

তখনই চিকিৎসকের নজরে পড়ে। এছাড়া রোগীর হৃৎস্পন্দনের শব্দ পরিবর্ধিত করে চিকিৎসককে শোনাবার ব্যবস্থা থাকে। কোন সময় যদি ঐ শব্দ অস্বাভাবিক বলে চিকিৎসকের মনে হয়, তিনি পাঁচ মিনিট আগেকার শব্দের সঙ্গে তখনই তা তুলনা করে দেখতে পারেন। যে ফিতার উপর ঐ শব্দের সংকেত ধরা থাকছে, সেটির পাঁচ মিনিট আগেকার অংশ আবার বাজালেই পাঁচ মিনিট আগের শব্দ তিনি এখন ফের শুনতে পাবেন। অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন পর্যায়ে রোগীর অবস্থা কেমন থাকছে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসার কোন হেরফের করতে হবে কি না, চিকিৎসক এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে তা বুঝতে পারেন। কঠিন অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকের সহকারী হিসাবে ঐ যন্ত্রের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসকে অচল করে তার পরিবর্তে 'হার্ট-লাং' যন্ত্র নামে একটি অত্যাশ্চর্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচার চলবার সময় এই যন্ত্রটি দেহের বাইরে থেকেই হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কাজ সঠিকভাবে করে যায়। এই যন্ত্রের জন্যে যে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দরকার, তা সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনিক্সের যথাযথ প্রয়োগে।

বিবিধ

কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হলে ক্রমাগত সেই অবস্থা নির্ধারণ করবার জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে। যদি অবস্থা গুরুতর হয়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে জানাবার জন্যে যান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই একটি ঘণ্টা বাজতে থাকে বা একটি আলো জ্বলে ওঠে।

হৃদ্‌রোগের ফলে যদি কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন ব্যাহত হতে থাকে, তবে সেটা তার দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। এরকম রোগীর জন্যে ক্ষুদ্র হৃৎস্পন্দন-সহায়ক যন্ত্র নির্মিত হয়েছে।

সামান্য অস্ত্রোপচার করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিকে বক্ষচর্মের নিচে বসিয়ে তার দিয়ে একে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। ব্যাটারী-চালিত এই যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে হৃৎপিণ্ডকে তার স্বাভাবিক স্পন্দন বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই রকম যন্ত্রের ব্যবহার এখন প্রতি বছর কয়েক হাজার করে বাড়ছে।

যাঁরা কানে কম শোনেন, তাঁদের জন্যে এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও শব্দকে যথেষ্ট পরিবর্ধিত করে তাঁদের শুনতে সাহায্য করে। যাঁদের কোন অঙ্গহানির ফলে কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করতে হয়, তাঁদের ঐ অঙ্গের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায়।

দেহের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, তাদের কোনটির মধ্যে কোন ভাঙচুর ঘটেছে কি না অথবা ফোড়াজাতীয় কোন কিছুর উৎপত্তি হয়েছে কি না—দেহের বাইরে থেকেই এই সব নির্ণয় করবার জন্যে আজকাল শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ মাথার মধ্যে ফোড়া হলে তা নির্ধারণ করবার পক্ষে এই তরঙ্গ অত্যন্ত উপযোগী। শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রকৃতি সাধারণ শব্দ-তরঙ্গের মত, তবে এর কম্পাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশি। এই তরঙ্গ আমাদের দেহের মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। শব্দোত্তর তরঙ্গের উৎপত্তি ও প্রয়োগের মূলে রয়েছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

মাথার মধ্যে যে ফোড়ার কথা বলা হল, সেটা দেহের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। বর্তমানে এর চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে লেসার যন্ত্রের সহায়তায়। লেসার থেকে যে শক্তিশালী আলোকরশ্মি পাওয়া যায়, তাকে মাথার মধ্যে পাঠিয়ে ফোড়া নষ্ট করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া লেসার-রশ্মি প্রয়োগে অক্ষিপটের ছিন্ন স্নায়ু জোড়া দেবার মত সূক্ষ্ম কাজও এখন করতে পারা যাচ্ছে।

কোন রোগীকে প্রয়োজন মত অচেতন করবার জন্যে ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের কথা আমরা সকলেই জানি। এখন কিন্তু রোগীর মস্তিষ্কের

মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়েও তাকে অচেতন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে রোগীর কোন রকম কষ্ট হয় না। ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলেই আবার রোগীর চেতনা ফিরে আসে। যে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয়, তার নাম ইলেকট্রোঅ্যানাস্থেসিয়া (Electroanaesthesia)। এই যন্ত্র আমাদের দেশেও বর্তমানে প্রস্তুত হচ্ছে।

বস্তুতঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে, নানারকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কোন আধুনিক হাস-পাতালের কথা এখন ভাবাই যায় না।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

(১)

ভাই বাতায়নদা,

আজ কলেজে ইলেকট্রনের বিষয় পড়াতে পড়াতে আমাদের অধ্যাপিকা সবিতাদি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা আমাদের বলছিলেন। সাধারণ যে সব আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আমরা দেখেছি, ক্ষুদ্র কোন বস্তুকে তার বড় করে দেখানোর যে ক্ষমতা, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা নাকি তার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি। অর্থাৎ আমাদের চোখের তুলনায় আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা যতখানি বেশি, আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় আবার প্রায় ততখানিই বেশি ক্ষমতা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের। এটা সম্ভব হয়েছে, সবিতাদি বললেন, কারণ আলোক তরঙ্গের পরিবর্তে ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রন তরঙ্গকে ব্যবহার করা হয়।

ইলেকট্রনকে তো বস্তুকণিকা বলে জানি, তার আবার তরঙ্গ কী? আর তরঙ্গ হলেই বা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা এত বেশি কেন? কী পদ্ধতিতে কাজ করে এই আশ্চর্য যন্ত্র?—মাথার মধ্যে এই সব প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল, কিন্তু জানো তো সবিতাদিকে কী ভয়ঙ্কর ভয় করি, ওঁকে জিগ্যেস করতে তাই সাহস হয় নি। সবিতাদি বলছিলেন, কলকাতায় তোমাদের সায়েন্স কলেজে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে। তোমার কথা তখনই মনে হয়েছিল, বাতায়নদা—দরকার হলেই তো তোমার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো-বাতাস আমার কাছে পৌঁছয় বলে তোমার এই নামকরণ! বাড়ি ফিরে তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি প্রশ্নগুলির উত্তর চেয়ে। ইতি—

বোলপুর
১০।১১।৭৮

তোমার স্নেহের
বোলতা

(২)

কল্যাণীয়াসু,

……তুমি দেখছি, বোল্‌তা, আবার প্রশ্নের হুল ফোটাতে শুরু করেছ। শোধ নেওয়ার জন্যে আমিও বিশদভাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। দেখা যাক, ধৈর্য ধরে সবটা পড়তে পারো কি না।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের প্রবর্তন করেন, যাকে এখন পুরনো কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বলা হয়, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তির রূপ দু' প্রকার—একটি তরঙ্গরূপ, এর সঙ্গেই আমরা সচরাচর পরিচিত, অন্যটি কণারূপ। কোন বস্তু থেকে যখন শক্তি নিঃসৃত হয় বা কোন বস্তুর দ্বারা যখন শক্তি শোষিত হয়, তখন অবিচ্ছিন্নভাবে তা হতে পারে না, কারণ বিশেষ পরিমাপের শক্তির একক অবিভাজ্য কণা 'কোয়াণ্টাম' হিসাবে থাকে। ঐ কণায় শক্তির পরিমাণঃ $E = hf$, h যেখানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, ৬·৬২৬ × ১০$^{-২৭}$ আর্গ-সেকেণ্ড, প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয় একে, আর f হল শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গের কম্পাঙ্ক।

এই শতাব্দীর বিশের দশকে দ্য ব্রগ্‌লি, শ্রডিংগার, হাইসেনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যে নতুন কোয়াণ্টাম তত্ত্ব প্রবর্তন করলেন, যাকে ওয়েভ মেকানিক্স অর্থাৎ তরঙ্গ বলবিদ্যা বলা হয়, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তির যেমন দ্বৈত রূপ, বস্তুরও আবার রূপ তেমনি দু'টি—কণারূপ, যার সঙ্গে আমরা সাধারণতঃ পরিচিত আর দ্বিতীয়টি তরঙ্গরূপ। ঐ তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $v = h/mv$, m ও v যেখানে যথাক্রমে বস্তুটির ভর ও গতিবেগ।

সুতরাং বুঝছো ইলেকট্রন বস্তুর কণা ঠিকই, কিন্তু তার একটি তরঙ্গ-ধর্মও আছে। এবং ইলেকট্রনের গতি যত বেশি হয়, ইলেকট্রন তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তত হ্রাস পায় ও ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্মিতা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ৫০,০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপ

প্রয়োগ করলে ইলেকট্রনের গতি হয় সেকেণ্ডে প্রায় ১'৩ লক্ষ কিলোমিটার ও তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৫×১০^{-১০} সেন্টিমিটার বা ০'০৫ অ্যাংস্ট্রম, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লক্ষ ভাগের মাত্র এক ভাগের মত।

কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে ক্ষুদ্রতম বৃত্তাকার বস্তুকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে পৃথক করে দেখতে পারি, সেই বস্তুর ব্যাসের দৈর্ঘ্যকে যন্ত্রটির বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Resolving power) বলে। ধরা যাক, ঐ দৈর্ঘ্য হল 'ব'। এখন, বস্তুটিকে বড় করে দেখানোর জন্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, 'ব' তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক। দৃশ্য আলো ব্যবহৃত হলে 'ব' হয় প্রায় ২,০০০ অ্যাংস্ট্রম, আর অতি-বেগুনি আলো যদি ব্যবহার করা হয়, 'ব' তাহলে প্রায় ১,০০০ অ্যাংস্ট্রম। ৫০,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ-চাপে যদি ইলেকট্রনকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই ইলেকট্রন তরঙ্গের ক্ষেত্রে 'ব' হয় মাত্র ০'০২৫ অ্যাংস্ট্রমের মত, অর্থাৎ একটি পরমাণুর ব্যাসের থেকেও অনেক ছোট। সহজেই বোঝা যায় যে, বিদ্যুৎ-চাপকে আরো বাড়িয়ে তত্ত্বগতভাবে 'ব'-কে আরও ছোট করে ফেলা সম্ভব। বস্তুতঃ বর্তমানে এমন কয়েকটি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যেগুলিতে কয়েক লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপ ব্যবহার করা হয়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ই-অ যন্ত্রে (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে এখন থেকে আমি সংক্ষেপে ই-অ যন্ত্র লিখবো) ক্ষুদ্রতম যে 'ব' সম্ভব হয়েছে, তা প্রায় ২ অ্যাংস্ট্রম। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের এই বৈষম্যের জন্যে ইলেকট্রন তরঙ্গ অবশ্য দায়ী নয়, দায়ী হল দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণের বিশেষ রকম প্রক্রিয়া ও ই-অ যন্ত্রে যে লেন্সগুলি ব্যবহৃত হয়, তাদের নানাবিধ ত্রুটি।

তবে ই-অ যন্ত্রের আলোচনায় সব সময় যে ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ বিবেচ্য হয়, তা নয়; কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন যন্ত্রে ব্যবহৃত লেন্সের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে এর কণারূপটি গ্রাহ্য হয় এবং তখন সনাতনী

পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ চলে। এই যে কখনো তরঙ্গ তত্ত্বের প্রয়োগ আর কখনো সনাতনী তত্ত্বের, এতে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যান। এককালে তাই প্রায়ই উপহাস করে বলা হত —সোম, বুধ ও শুক্রবার তরঙ্গ তত্ত্বের প্রয়োগ বিধেয়, আর সপ্তাহের অন্যান্য দিন সনাতনী তত্ত্বের।

যাই হোক, ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্মিতা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করবার পর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের এক গবেষণাগারে ব্রিউখে ও জোহানসন প্রথমে ই-অ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। প্রায় একই সময়ে বার্লিনের অন্য এক গবেষণাগারে আর একটি ই-অ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন নোল ও রুস্কা। বর্তমানে যে ধরনের ই-অ যন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত—যাদের নির্গমন ই-অ যন্ত্র (Transmission electron microscope) বলা হয়, এইটিই সেই জাতীয় প্রথম যন্ত্র। তবে যন্ত্রের পরিবর্ধনের ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তখন অত্যন্ত অল্প ছিল এবং যন্ত্রের সাফল্যের সমস্যাও ছিল নানাপ্রকার। বহু বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি তো এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করতেন না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই কেবল যন্ত্রের ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে। ই-অ যন্ত্রে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতাকে সর্বপ্রথম অতিক্রম করা সম্ভব হয় ১৯৩৫ সালে। রুস্কার উদ্ভাবিত যন্ত্রে কাজ করে ও তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে তাতে কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করে ড্রীষ্ট ও মিউলার এই সাফল্য লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে সীমেন্স ও হাল্‌স্‌কে কোম্পানী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ই-অ যন্ত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৯ সালে ফন বোরিস ও রুস্কার সহায়তায় তাঁদের তৈরী প্রথম প্রমাণ মাফিক ই-অ যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়।

আমি এইসঙ্গে যে ছবিগুলি পাঠাচ্ছি, তাদের প্রথমটি (১নং চিত্র) দেখলে ই-অ যন্ত্র কেমন ভাবে কাজ করে, তার মূল কথাগুলি বুঝতে পারবে। ছবিটিতে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে এই যন্ত্রের কার্যপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। আলোক অণুবীক্ষণ

যন্ত্রের কার্যপ্রণালী নিশ্চয় জানো ; জানো যে, বাতির আলো ঘনীকারক (Condenser) লেন্সের সাহায্যে কেমন করে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর সংহত হয়, বস্তুটি থেকে নির্গত আলো কেমন করে বস্তুমুখী (Objective) লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে একটি মধ্যবর্তী প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে এবং চক্ষু-সমীপস্থ লেন্স (Eye-piece) কেমন ভাবে ঐ প্রতিবিম্বকে আরো

১নং চিত্র
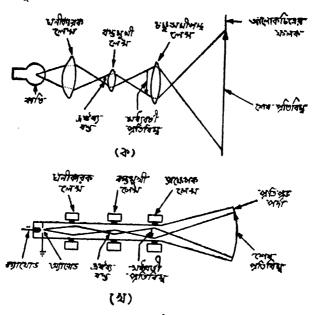
(ক) আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

(খ) নির্গমন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

পরিবর্ধিত করে দর্শকের দৃষ্টিগোচরে বা আলোকচিত্রের ফলকের উপর উপস্থাপিত করে।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেখানে আলোক তরঙ্গের উৎস হচ্ছে বাতি, ই-অ যন্ত্রে সেখানে ইলেকট্রন তরঙ্গের উৎস হল ইলেকট্রন বন্দুক

(Electron gun)—ঋণাত্মক ক্যাথোড ও ধনাত্মক অ্যানোড যার প্রধান অংশ। ঐ ইলেকট্রন বন্দুকের মধ্যে অত্যুত্তপ্ত টাংস্টেনের তার থেকে যে সব ইলেকট্রন নির্গত হয়, ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে সাধারণতঃ ৫০ থেকে ১০০ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপ প্রয়োগ করে তাদের ত্বরান্বিত করা হয়। ফলে ইলেকট্রন বন্দুক থেকে যে ইলেকট্রনরা বেরিয়ে আসে, তারা বিশেষ দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়।

ই-অ যন্ত্রেও ঘনীকারক ও বস্তুমুখী লেন্স আছে, আর চক্ষু-সমীপস্থ লেন্সের কাজ যে করে, তার নাম প্রক্ষেপক (Projector) লেন্স। কোন লেন্সই অবশ্য এক্ষেত্রে কাঁচের নয়, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক লেন্সই সব ক'টি। এই লেন্সগুলির যে বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র, তাদের দ্বারা ইলেকট্রনের গতি প্রভাবান্বিত হয়।

ই-অ যন্ত্রে প্রক্ষেপক লেন্স ও দর্শকের চক্ষুর মধ্যে থাকে একটি প্রতিপ্রভ পর্দা। ইলেকট্রন এই পর্দার উপর পড়লে তা থেকে আলো নিঃসৃত হয় ও দ্রষ্টব্য বস্তুর বহুগুণ পরিবর্ধিত প্রতিবিম্ব এই পর্দার উপর দেখতে পাওয়া যায়।

যন্ত্রের বাইরে ক্যামেরা রেখে তার সাহায্যে প্রতিবিম্বের ছবি তুলে রাখা যায়। তবে আজকাল সাধারণতঃ যন্ত্রের ভিতরেই আলোক-চিত্রের ফিল্ম বা ফলক রেখে ছবি তোলবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইলেকট্রন বন্দুক থেকে প্রতিপ্রভ পর্দা পর্যন্ত যন্ত্রের দৈর্ঘ্য হয় সাধারণতঃ প্রায় চার ফুট।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে ই-অ যন্ত্রের কর্মপদ্ধতির একটি পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত যন্ত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুর স্বচ্ছ অংশের মধ্য দিয়ে আলো চলে যায় বলে প্রতিবিম্বের ঐ অংশগুলি সাদা দেখায়। কিন্তু অনচ্ছ অংশগুলিতে আলো শোষিত হওয়ায় প্রতিবিম্বে ঐ সব অংশ আলোর অভাবে কালো দেখায়। ই-অ যন্ত্রে এই শোষণের স্থান নেয় বিচ্ছুরণ (Scattering)। দ্রষ্টব্য বস্তুর যে সব স্থলে পরমাণু রয়েছে, সেখান থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। ঐ সব

বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র না থাকলে ইলেকট্রনরা প্রতিবিম্বের যে স্থানে এসে উপস্থিত হত, এখন সেখানে ফাঁক থেকে যায় এবং সেই সব ফাঁক থেকে বিচ্ছুরণ-কেন্দ্রের উপস্থিতি জানতে পারা যায়। বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র যদি বড় হয়, তাহলে তাই থেকে বেশি ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয় ও প্রতিবিম্বে ফাঁকটি বড় হয়ে দেখা দেয়। বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র ছোট হলে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনের সংখ্যা কম হয় ও প্রতিবিম্বের ফাঁকটিও ছোট হয়। প্রতিবিম্বে এইভাবে দ্রষ্টব্য বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপটি ধরা পড়ে। এ পর্যন্ত বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত যা হিসেব হয়েছে, তা থেকে মনে হয় ভারী পরমাণুকে সরাসরি প্রতিবিম্বে দেখা সম্ভব ; হাল্কা পরমাণুকে কিন্তু পৃথকভাবে দেখা যাবে না—যা দেখা যাবে, তা হল হাল্কা পরমাণুর সমষ্টি বা অণু।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হল, প্রথমোক্ত যন্ত্রে বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্যে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর আপতিত আলোক-রশ্মির আপতন কোণ বেশ অনেকখানি পর্যন্ত প্রশস্ত হয়, দ্বিতীয় যন্ত্রে কিন্তু এই কোণ সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ফলে, দ্বিতীয়টির ফোকাস-গভীরত্ব প্রথমটির তুলনায় যথেষ্ট বেশি। তুমি তোমার দাদার ক্যামেরায় যখন ছবি তুলেছ, তখন নিশ্চয় ফোকাস-গভীরত্বের গুরুত্ব জানো। এই গভীরত্ব যত বেশি হয়, তত বেশি স্থানকে একসঙ্গে ফোকাস করা সম্ভব।

১নং চিত্রে ই-অ যন্ত্রের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাতে আরো জটিল বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমি এখানে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

ইলেকট্রনদের দ্রুতগতির জন্যে যে উচ্চ পরিমাণ বিদ্যুৎ-চাপ ও লেন্সগুলির জন্যে যে বিদ্যুৎ-চাপ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ ব্যবহৃত হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছুটা পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। সেই পরিবর্তনকে স্বল্প পরিসরে রাখবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

পাম্পের সাহায্যে ই-অ যন্ত্রের ভিতরের প্রকোষ্ঠে বায়ুর চাপ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক কমিয়ে রাখতে হয়। ভূপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের যে চাপ, তার কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগের মত এই চাপ। বায়ুর চাপ বাড়লে ইলেকট্রনদের গতি ব্যাহত হয়।

এই যন্ত্রে এমন বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, যাতে দ্রষ্টব্য বস্তু ও আলোক-চিত্রের ফিল্ম বা ফলক বাইরে থেকে সহজে বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে ঢোকানো যায় বা প্রকোষ্ঠের ভিতর থেকে সহজে বাইরে আনা যায়।

প্রতিবিম্বের পরিবর্ধনের মাত্রা বাড়ানোর জন্যে অনেক সময় বস্তুমুখী ও প্রক্ষেপক লেন্সের মধ্যস্থলে এক বা একাধিক মধ্যবর্তী (Intermediate) লেন্স ব্যবহৃত হয়। প্রতিবিম্বের বিকৃতি এই লেন্স সংশোধন করে দেয়। কোন কোন যন্ত্রে আবার পরপর অনেকগুলি প্রক্ষেপক লেন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রতিবিম্বের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রগুলিতে একটি অতিরিক্ত ঘনীকারক লেন্স যোগ করা হয়; দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর যে ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পড়ে, তাকে আরো ভাল ভাবে এতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়।

দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর যাতে কোন ময়লা না জমে, সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি যন্ত্রে -৮০° সেল্‌সিয়াস উষ্ণতায় রক্ষিত অতি শীতল একটি প্রকোষ্ঠের দ্বারা বস্তুটিকে আবৃত রাখবার ব্যবস্থা থাকে।

এতক্ষণ যে ই-অ যন্ত্রের কথা বললাম, তাতে ইলেকট্রন দ্রষ্টব্য বস্তুর এক পৃষ্ঠে প্রবেশ করে অন্য পৃষ্ঠে নির্গত হয় বলে এর নাম নির্গমন (Transmission) অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এ ছাড়াও অন্যান্য রকম ই-অ যন্ত্র আছে, যথা—প্রতিফলন (Reflection), নিঃসরণ (Emission), স্ক্যানিং (Scanning) ও ছায়া (Shadow) অণুবীক্ষণ যন্ত্র। ২, ৩, ৪ ও ৫নং চিত্র দেখলে এদের কর্মপদ্ধতি বুঝতে পারবে। তবে পরিবর্ধনের মাত্রা নির্গমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেরই
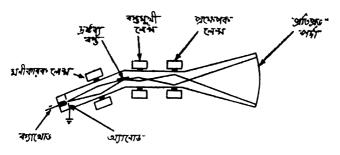
২নং চিত্র—প্রতিফলন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র
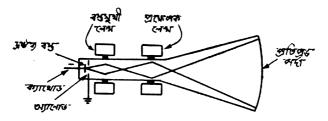
৩নং চিত্র—নিঃসরণ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

৪নং চিত্র—স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র
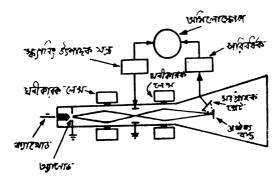
সবচেয়ে বেশি। এতে দ্রষ্টব্য বস্তুকে ৫ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বড় করে দেখা যেতে পারে।

৫নং চিত্র—ছায়া ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র
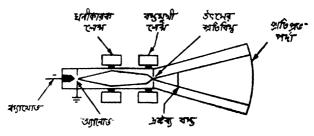
আজ এখানেই এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি। তোমার মনে যে সব প্রশ্ন গুনগুন করে উঠবে, বোল্‌তা, সেগুলি শোনবার অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি—

কলকাতা　　　　　　　　　　　　তোমার বাতায়নদা

২৫/১১/৭৮

(৩)

ভাই বাতায়নদা,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম। চিঠিটা পড়ে যে দু'টি প্রশ্ন মাথায় এসেছে, তাই জানিয়ে তোমায় উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমতঃ, তোমার ২, ৩, ৪ ও ৫নং চিত্র দেখে কিছুই পরিষ্কার করে বুঝতে প্যারলাম না। তোমার এই মাথা-মোটা ছাত্রীকে একটু খোলসা করে বুঝিয়ে দেবে কি?

দ্বিতীয়তঃ, আমি যে সব লেন্সের সঙ্গে পরিচিত, যেমন ক্যামেরা, দূরবীন বা আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স, সেগুলো সবই কাঁচের তৈরী। কিন্তু ই-অ যন্ত্রে যে লেন্সগুলি ব্যবহৃত হয়, তুমি তাদের বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক বলেছ। ওগুলি ঠিক কি ধরনের বস্তু?…ইতি—

বোলপুর　　　　　　　　　　　　তোমার স্নেহের

৩/১২/৭৮　　　　　　　　　　　　বোল্‌তা

কল্যাণীয়াসু,

…নির্গমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিফলন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পার্থক্য হল এই যে, শেষোক্ত যন্ত্রে ঘনীকারক লেন্সের দ্বারা সংহত ইলেকট্রনগুচ্ছ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে নির্গত না হয়ে ঐ বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে বস্তুমুখী লেন্সের উপর পড়ে। আলো যে ভাবে ধাতব পদার্থ থেকে প্রতিফলিত হয়, এই প্রতিফলন অবশ্য ঠিক সেই রকম নয়। এখানে ইলেকট্রনরা দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে একটি ছোট কোণের মধ্যে থাকে। তবে ঐ কোণটি ছোট হওয়ায় ইলেকট্রনরা বস্তুমুখী লেন্সের আওতার মধ্যেই থেকে যায়।

নিঃসরণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে ইলেকট্রনগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, তা দ্রষ্টব্য বস্তু থেকেই নিঃসৃত হয়। এই নিঃসরণ নানাভাবে সম্ভব হতে পারে—যেমন, দ্রষ্টব্য বস্তুটি ধাতব হলে উত্তাপের সাহায্যে। অধিকাংশ ধাতুর ক্ষেত্রেই কিন্তু যথেষ্ট ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্যে অধিক উষ্ণতার প্রয়োজন বলে বস্তুটির উপর সাধারণতঃ বেরিয়াম বা সিজিয়ামের একটি পাতলা আস্তরণ দেওয়া থাকে; কারণ অপেক্ষাকৃত অল্প উষ্ণতাতেই বেরিয়াম ও সিজিয়াম থেকে প্রচুর ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। এছাড়াও যে ভাবে এই নিঃসরণ সম্ভব, তা হল দ্রষ্টব্য বস্তুটির উপর আলো, অতি-বেগুনি আলো বা একটি ধনাত্মক আয়নগুচ্ছ নিক্ষেপ করে, অথবা বস্তুটির সঙ্গে তেজস্ক্রিয় কোন পদার্থের সংযোগ ঘটিয়ে।

ই-অ যন্ত্র পরিবারের প্রাচীনতম সভ্য এই নিঃসরণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র। বর্তমানে অবশ্য এর ব্যবহার খুবই সীমিত। দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রনগুলির বেগের মধ্যে প্রচুর তারতম্য থাকায় প্রতিবিম্বে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে একটি বিশেষ ধরনের ত্রুটি—যে ত্রুটিকে বলা হয় বর্ণাপেরণ (Chromatic aberration)। ফলে এই যন্ত্রে উচ্চ মাত্রার বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।

টেলিভিসনে স্ক্যানিং-এর বিষয় তুমি বোধহয় জানো। স্ক্যানিং

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি সরু ইলেকট্রনগুচ্ছকে দ্রষ্টব্য বস্তুর সম্মুখভাগের উপর স্ক্যান করানো হয়, অর্থাৎ ইলেকট্রনগুচ্ছটিকে ওর উপর দিয়ে যাতায়াত করানো হয় একটি বিশেষ ধারা অনুযায়ী। এর ফলে দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে যে সব ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়, তারা একটি সংগ্রাহক প্লেটের মাধ্যমে এক বৈদ্যুতিক সংকেতের সৃষ্টি করে। পরিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে সংকেতটিকে পরিবর্ধিত করে ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপে পাঠানো হয়। স্ক্যানিং-এর জন্যে যে উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, অসিলোস্কোপের সঙ্গে তারও যোগাযোগ থাকে বলে দ্রষ্টব্য বস্তুটির প্রতিবিম্ব সরাসরি অসিলোস্কোপে দেখতে পাওয়া যায়।

ছায়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুর একদিকে থাকে একটি ইলেকট্রন উৎস ও অন্যদিকে থাকে একটি প্রতিপ্রভ পর্দা বা আলোকচিত্রের ফলক। বুঝতে পারছো, ঐ পর্দা বা ফলকের উপর দ্রষ্টব্য বস্তুটির ছায়া পড়বে এবং বস্তুটির অনচ্ছ অংশগুলির তুলনায় স্বচ্ছ অংশগুলির মধ্য দিয়ে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন নির্গত হওয়ায় ছায়ার মধ্যে বস্তুটির ভিতরের গঠন-বৈচিত্র্য প্রকাশ পাবে। ইলেকট্রনের উৎস থেকে পর্দা বা ফলকের দূরত্ব উৎসটি থেকে দ্রষ্টব্য বস্তুর দূরত্বের তুলনায় যত বড় হবে, প্রতিবিম্বের পরিবর্ধনের মাত্রাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা উৎসের আয়তনের উপর নির্ভর করে ও ঐ আয়তনেরই প্রায় সমান হয়। ৫নং চিত্রে এজন্যে দেখবে, দু'টি লেন্সের সাহায্যে প্রাথমিক ইলেকট্রন উৎসের একটি হ্রাসপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়—ঐ প্রতিবিম্ব দ্রষ্টব্য বস্তুর ছায়া ফেলবার জন্যে উৎস হিসাবে কাজ করে। তা সত্ত্বেও আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে এ যন্ত্রের কার্যকারিতা বিশেষ কিছু বাড়ানো সম্ভব হয় নি। সে-জন্যে ই-অ যন্ত্রের শৈশব অবস্থায় এই ধরনের যন্ত্র চালু থাকলেও এর ব্যবহার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এই যন্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করে এক্স্ রশ্মি অণুবীক্ষণ যন্ত্র গঠন করা হয়েছে, যার সাহায্যে বস্তুর ভিতর মহলের অনেক খবর জানতে পারা যাচ্ছে।

অতঃপর, বোলতা, লেন্স সংক্রান্ত তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস করবো।

কাঁচের লেন্সের মধ্য দিয়ে যখন আলোক-রশ্মি পাঠানো হয়, তখন তুমি জানো, আলোক-রশ্মিগুলির আপতন কোণ বিভিন্ন হওয়ায় তাদের গতিপথ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাঁচের লেন্সের সাহায্যে আলোকে যে কেন্দ্রীভূত করা যায় বা কোন দ্রব্যের প্রতিবিম্বকে যে পরিবর্ধিত আকারে দেখানো যায়, তার মূলে হল এই বৈশিষ্ট্য।

ই-অ যন্ত্রে আলোক-রশ্মির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় গতিশীল ইলেকট্রন। ইলেকট্রন-কণা বিদ্যুৎ-সমন্বিত হওয়ায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে তাদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যে উপকরণের সাহায্যে এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়, তার নাম বৈদ্যুতিক লেন্স।

তুমি নিশ্চয় জানো গতিশীল ইলেকট্রন হল বিদ্যুৎপ্রবাহ, আর বিদ্যুৎপ্রবাহ চুম্বকক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। অতএব বুঝতে পারছো, গতিশীল ইলেকট্রনদের গতিপথ চুম্বকক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। চৌম্বক লেন্সের কার্যকারিতার মূলে রয়েছে এই ঘটনা।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাঁচের লেন্সের সাহায্যে কোন দ্রষ্টব্য বস্তুকে ফোকাস করতে হলে লেন্সটিকে এগিয়ে-পিছিয়ে ঠিকমত জায়গায় রাখতে হয়। ই-অ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক লেন্সকে স্থির রেখে ওদের ভিতরের বিদ্যুৎ-চাপ বা বিদ্যুৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ফোকাস করবার কাজটি সম্ভবপর হয়।

কাঁচের লেন্সের তুলনায় এই লেন্সগুলির এ সুবিধা আছে ঠিকই, তবে কাচের লেন্সের মত এ সব লেন্সেও গোলাপেরণ (Spherical aberration), বর্ণাপেরণ (Chromatic aberration), বিষম দৃষ্টি (Astigmatism) প্রভৃতি ত্রুটি থাকতে পারে। নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে এগুলিকে যতদূর সম্ভব এড়ানো হয়।

চৌম্বক লেন্সের কার্যকারিতার জন্যে যে জটিল সার্কিটের প্রয়োজন,

বৈদ্যুতিক লেন্সের সার্কিট তার তুলনায় সরল এবং সেজন্যে স্বল্প-মূল্যেরও। কিন্তু চৌম্বক লেন্সের বিশ্লেষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি এবং এর সার্কিট জটিল হলেও আজকের উন্নত ইলেকট্রনিক্সের যুগে এমন কিছু দুরূহ নয়। বর্তমানে অধিকাংশ ই-অ যন্ত্রেই চৌম্বক লেন্স ব্যবহৃত হয়।

ই-অ যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এতক্ষণে, আশা করি, তোমার খানিকটা ধারণা হয়েছে। এরপর যখন কলকাতায় আসবে, আগে থাকতে জানিও—সম্ভব হলে তোমায় ই-অ যন্ত্র দেখাবার ব্যবস্থা করবো। ইতি—

কলকাতা তোমার বাতায়নদা

১৬।১২।৭৮

(৫)

ভাই বাতায়নদা,

তোমার চিঠি পড়ে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র কেমন ভাবে কাজ করে কিছুটা বুঝেছি। অবশ্য, প্রথম বার পড়ে অল্পই বোঝা গেছলো, বারবার পড়তে পড়তে ক্রমশঃ ব্যাপারটা খোলসা হচ্ছে। এ যেন আমার অজ্ঞানতার মেঘের পর মেঘ জমে আছে—এক একবার চিঠি পড়ি, আর এক একটা মেঘ কেটে যায়, আলোর আভাস খানিকটা বাড়ে।

কিন্তু আলোর স্বাদ পেলেই আরো আলো পাবার ইচ্ছা জাগে। তোমার কাছে আমার তাই আরো প্রশ্ন আছে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা নতুন কিছু কি জানতে পেরেছেন? আর যদি জেনে থাকেন, মানুষের কাজে লাগে কি সেই জ্ঞান?…ইতি—

বোলপুর তোমার স্নেহের

২৩।১২।৭৮ বোলতা

(৬)

কল্যাণীয়াসু,

···বোলপুরের বোল্‌তা দেখছি আজকাল শুধু প্রশ্নের হুলই ফোটাচ্ছে না, তার মুখেও বেশ বোল্‌চাল ফুটেছে—অজ্ঞানতা, মেঘ, আরো কত কী !

যাহোক, তোমার কৌতূহল আমার ভাল লেগেছে। আর তার পুরস্কার হিসেবে তোমার প্রশ্নের উত্তর এখন তোমায় উপহার দেব।

ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে জীব ও জড়, দুই জগতের সম্পর্কেই বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছেন। এই ব্যাপারে তাঁদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে যে ধরনের ই-অ যন্ত্র, তা হল নির্গমন ধরনের। এর পরিবর্ধনের ক্ষমতা যে সবচেয়ে বেশি, সে কথা তো তোমায় আগেই জানিয়েছি। তবে সাম্প্রতিক কালে এই কাজে স্ক্যানিং ই-অ যন্ত্রেরও প্রভূত প্রয়োগ হচ্ছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কেম্‌ব্রিজে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই যন্ত্রের সর্বপ্রথম উৎপাদন হয়। নির্গমন ই-অ যন্ত্রের জন্যে যেখানে অত্যন্ত পাতলা নমুনার (Specimen) দরকার হয়—যাতে ইলেকট্রনগুচ্ছ তার মধ্য দিয়ে যেতে পারে, স্ক্যানিং ই-অ যন্ত্রে সেখানে দ্রষ্টব্য বস্তুর বহির্তলে ইলেকট্রনগুচ্ছের চলাফেরা সীমাবদ্ধ থাকে বলে ঐ রকম নমুনার দরকার হয় না এবং এই বহির্তলের সব খুঁটিনাটি যন্ত্রে তোলা ছবিতে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রে পরিবর্ধনের মাত্রা ৫০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

জৈব বস্তু সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ই-অ যন্ত্র ব্যবহারের পথিকৃৎ হলেন মার্টন, যিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুসেল্‌সে এই বিষয়ে কাজ শুরু করেন।

যে জীবের মধ্যে জটিলতা সবচেয়ে কম, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যাকে যোগসূত্র বলা চলে, তার নাম হল ভাইরাস। স্বাস্থ্যবিদ্যার ক্লাসে হয়তো এর নাম শুনে থাকবে ! না শুনলেও নিশ্চয় ডাক্তারবাবুদের মুখে শুনেছ। কারণ, নানা রোগের—যেমন ধরো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কোলাই,

বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক ইত্যাদি—যাদের ব্যাক্‌টিরিয়া বা জীবাণু শক্তিশালী আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায় না, তাদের মূলে রয়েছে ব্যাক্‌টিয়ার চেয়েও ছোট এই ভাইরাস। এদের দ্বারা শুধু যে প্রাণীদেহ আক্রান্ত হয়, তা নয় ; ব্যাক্‌টিরিয়োফাজ নামে এমন সব ভাইরাস আছে, যাদের দ্বারা ব্যাক্‌টিরিয়াও আক্রান্ত হয়। এই যে ভাইরাস, ই-অ যন্ত্রের সাহায্যেই কেবল এদের দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তোমাকে এই সঙ্গে যে ছবি পাঠাচ্ছি (আর্ট প্লেটে ৮নং চিত্র দ্রষ্টব্য), সেই ছবিতে ই-অ যন্ত্রে তোলা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও কোলাই ভাইরাসের ছবি দেখতে পাবে। ভাইরাস নানান আকৃতি ও আয়তনের হতে পারে। সবচেয়ে ছোটগুলির ব্যাস মাত্র ১৫০ অ্যাংস্ট্রমের মত অর্থাৎ আয়তনে এরা কোন কোন অণুর চেয়েও ছোট। ভাইরাস কেমন দেখতে, শুধু তাই নয়—এদের চালচলন কেমন, কত তাড়াতাড়ি এরা বংশবিস্তার করে, কা করেই বা এই বংশবিস্তারের প্রতিরোধ সম্ভব, এই সব বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গেছে।

আমাদের দেহে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটলে রক্তের শ্বেত কণিকা কিভাবে তাদের আক্রমণ করে গ্রাস করে ফেলে, তার বিশদ বিবরণ জানতে পারা গেছে ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে। এই গ্রাসলীলার বিভিন্ন পর্যায়ে ই-অ যন্ত্রে পরপর ছবি তুলে সম্পূর্ণ ঘটনাটি সুস্পষ্ট ভাবে দেখা সম্ভব হয়। এইরকম একটি ঘটনায় দেখা গেছে, মানুষের গলায় কয়েকটি স্ট্যাফাইলোকক্কাই ব্যাক্‌টিরিয়া এসে ঢুকলে ম্যাক্রোফাজ নামক অপেক্ষাকৃত বড় শ্বেত কণিকা তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং নিজের দেহের এক অংশ বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাক্‌টিরিয়াগুলিকে ঘিরে ফেলে নিজের দেহের মধ্যে টেনে নেয়—সাধারণ ভাবে বলা চলে, ম্যাক্রোফাজটি ব্যাক্‌টিরিয়াগুলিকে গিলে ফেলে। তারপর সে ধীরে ধীরে তাদের হজম করে ফেলে। সমস্ত প্রক্রিয়াটি ঘটতে সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা।

নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধের সংস্পর্শে ব্যাক্‌টিরিয়া ও

ভাইরাসের দেহের গঠনে কী পরিবর্তন হয়, সে সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর ই-অ· যন্ত্র আমাদের জানিয়েছে। কীট-পতঙ্গের দেহের অনেক সূক্ষ্ম অংশের কথাও আমরা এই যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পেরেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রজাপতির ডানার রামধনু-রঙা আঁশের কথা।

তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, টিকটিকি কেমন অনায়াসে ঘরের দেয়াল বেয়ে দৌড়তে পারে, ঘরের ভিতরের ছাদ দিয়ে মাথা-নিচু পা-উঁচু অবস্থায় কেমন অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। আমাদের মনে হয়, টিকটিকি যেন ম্যাজিক দেখাচ্ছে। এই ম্যাজিকের রহস্য নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জে. এফ. জেলারো উদ্ঘাটন করেছেন স্ক্যানিং ই-অ যন্ত্র ব্যবহার করে। ঐ যন্ত্রে তোলা ছবিতে দেখা গেছে, টিকটিকির পায়ের আঙুলে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র 'সাকশান কাপ' (Suction cup) আছে। এইগুলিতে সাময়িক ভাবে বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হলে বাইরের বায়ুর চাপ টিকটিকির পায়ের আঙুলগুলিকে দেয়াল বা ছাদের সঙ্গে চেপে ধরে রাখে। এই সাকশান কাপ আড়ে ১ মিলিমিটারের ১০ হাজার ভাগের ২ ভাগ মাত্র।

প্রাণীর দেহযন্ত্রের কয়েকটি অংশ, যেমন পেশী, স্নায়ু বা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কোষাদি, এই সব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমিত। সেই জ্ঞানকে বাড়ানোর কাজে ই-অ যন্ত্রের বহুল ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে। এদের আণবিক গঠন না হলেও অতি-আণবিক গঠন ও তাদের বৈশিষ্ট্যের বিষয় কিছু কিছু জানা গেছে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আমরা এ বিষয়ে আরো পরিষ্কার ভাবে জানতে পারবো।

এই প্রসঙ্গে তোমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথা জানাচ্ছি। বহুকাল ধরে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, প্রাণিদেহের মস্তিষ্কে সব কোষই এক ধরনের—যারা প্রয়োজন মত দেহের বিভিন্ন অংশে বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণ করে। কয়েক বছর আগে লণ্ডনের

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অক্টোপাসের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত যে গবেষণা হয়েছে, তাতে মনে হয়, প্রাণিদেহের মস্তিষ্কে আর এক ধরনের কোষও আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মস্তিষ্ক যখন জানে যে, কোন সংকেত দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক নির্দেশ বহন করছে, তখন ঐ দ্বিতীয় ধরনের কোষ থেকে একটি বিশেষ এনৃজাইম নিঃসৃত হয়ে সেই সংকেতের গতি রোধ করে। এই যে দু'ধরনের কোষ, এদের গঠনের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা সম্ভব হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রাণীর প্রজনন-কোষের আভ্যন্তরীণ পদার্থগুলির উপর গবেষণাতে সহায়তা করছে ই-অ যন্ত্র। প্রাণিদেহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বিশেষতঃ প্রোটিন সম্পর্কে অনেক নতুন কথাও ই-অ যন্ত্র আমাদের জানিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রোটিনের অপেক্ষাকৃত বড় অণুগুলি ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে কখনো অণুকে সরাসরি দেখার কথা চিন্তাই করা হত না।

তোমাকে আগেই বলেছি যে, ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে জড়জগতের অন্তর্লোকেও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষ করে রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা এর প্রসাদে পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে।

রসায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি আশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছে ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে হারানো সূক্ষ্ম যোগসূত্রের উদ্ধার করে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে রসায়নের গবেষণাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা চলে ঃ—

(১) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা—রসায়নে ই-অ যন্ত্রের এইটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, আলোক-চিত্রের ফিল্মকে ডেভেলপ করে যে নেগেটিভ তৈরি করা হয়, সেই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অনুঘটক কিভাবে কাজ করে, সিমেন্ট কেমন করে আস্তে আস্তে জমে যায়—এই রকম নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তরও জানা সম্ভব হচ্ছে।

(২) সেলুলোজ, ভাল্‌ক্যানাইজ-করা রবার প্রভৃতি যে সব বস্তুর গঠনে খানিকটা শৃঙ্খলা আছে, তাদের গঠন বৈচিত্র্যের নির্ণয়।

(৩) কঠিন অবস্থার বস্তুকণিকার আকার ও আয়তনের নির্ধারণ—কার্বন, ছাপাখানার কালির রঞ্জক (Pigment), কাদামাটি প্রভৃতি হরেক রকম বস্তুর কণিকা ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষিত হয়েছে। শিল্পপ্রধান সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে ধূলা ও ধেঁায়ার কণিকাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

এবার ধাতুবিদ্যার পক্ষ থেকে ই-অ যন্ত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা।

ধাতব পদার্থের আণবিক গঠন কতখানি সুসংবদ্ধ, কোন্ প্রক্রিয়ায় তার মধ্যে কেমন ধারা অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয়, ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে এই সব বিষয় অনুসন্ধান করা হচ্ছে। বহু ধাতব সঙ্করের আভ্যন্তরীণ গঠন, বিশেষতঃ তাদের ভঙ্গুরতার কারণ নির্ণয় করায় এই যন্ত্র বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে।

ধাতুকে পালিশ ও চিত্রিত করার জন্যে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ই-অ যন্ত্রের পরীক্ষার ফলে তাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানতে পারা গেছে।

দু'টি ধাতব পদার্থের মধ্যে সংযোগ-প্রক্রিয়া অনুধাবন করবার জন্যে ই-অ যন্ত্রের ভিতরেই অনেক সময় একটি ছোট্ট ওয়ার্কশপ-এর ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যুজ্জনিত উত্তাপে যখন পদার্থ দুটির সংযোগ ঘটে, তখন ঐ প্রক্রিয়া কেমন কার্যকরী হচ্ছে, বাইরে টেলিভিসনের পর্দায় তার পরিবর্ধিত চিত্র সঙ্গে সঙ্গে দেখার ব্যবস্থা থাকে।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগে ই-অ যন্ত্র কিভাবে সাহায্য করছে, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্সের ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি করবার জন্যে যে সিলিকন কেলাসের দরকার হয়, সেই কেলাসের প্রস্তুতি সম্পর্কিত অনেক তথ্য ই-অ যন্ত্র বিজ্ঞানীদের জানিয়েছে।

আমাদের দেশে ই-অ যন্ত্রের এ পর্যন্ত যা ব্যবহার হয়েছে, তা প্রধানতঃ কেবল জীববিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং যে যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, দুঃখের বিষয়, সেগুলি সবই বিদেশে তৈরী। আমাদের দেশে এখনো কোন কার্যকর ই-অ যন্ত্র তৈরী হয় নি, তৈরি করার কোন পরিকল্পনা আছে বলেও আমার জানা নেই। আমরা একান্তভাবে আশা পোষণ করি যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও এই যন্ত্র তৈরী হবে এবং শুধু জীববিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের প্রয়োগ করবেন।

ভোজের শেষ পাতে যেমন মিষ্টান্ন দেওয়া হয়, তোমায় তেমনি একটি মিষ্টি খবর দিয়ে এই চিঠি শেষ করবো। খবরটা হল এই :— তুমি তোমার কৌতূহল মেটানোর জন্যে এই সব চিঠিপত্র যে পড়ে ফেলেছ, তাইতে তুমি, হয়তো তোমার অজান্তেই, ঢুকে পড়েছ বিজ্ঞানের একেবারে অন্দর মহলে। এই সুখবর দিয়ে এবং এজন্যে তোমায় আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। ইতি—

কলকাতা তোমার বাতায়নদা

৮।১।৭৯